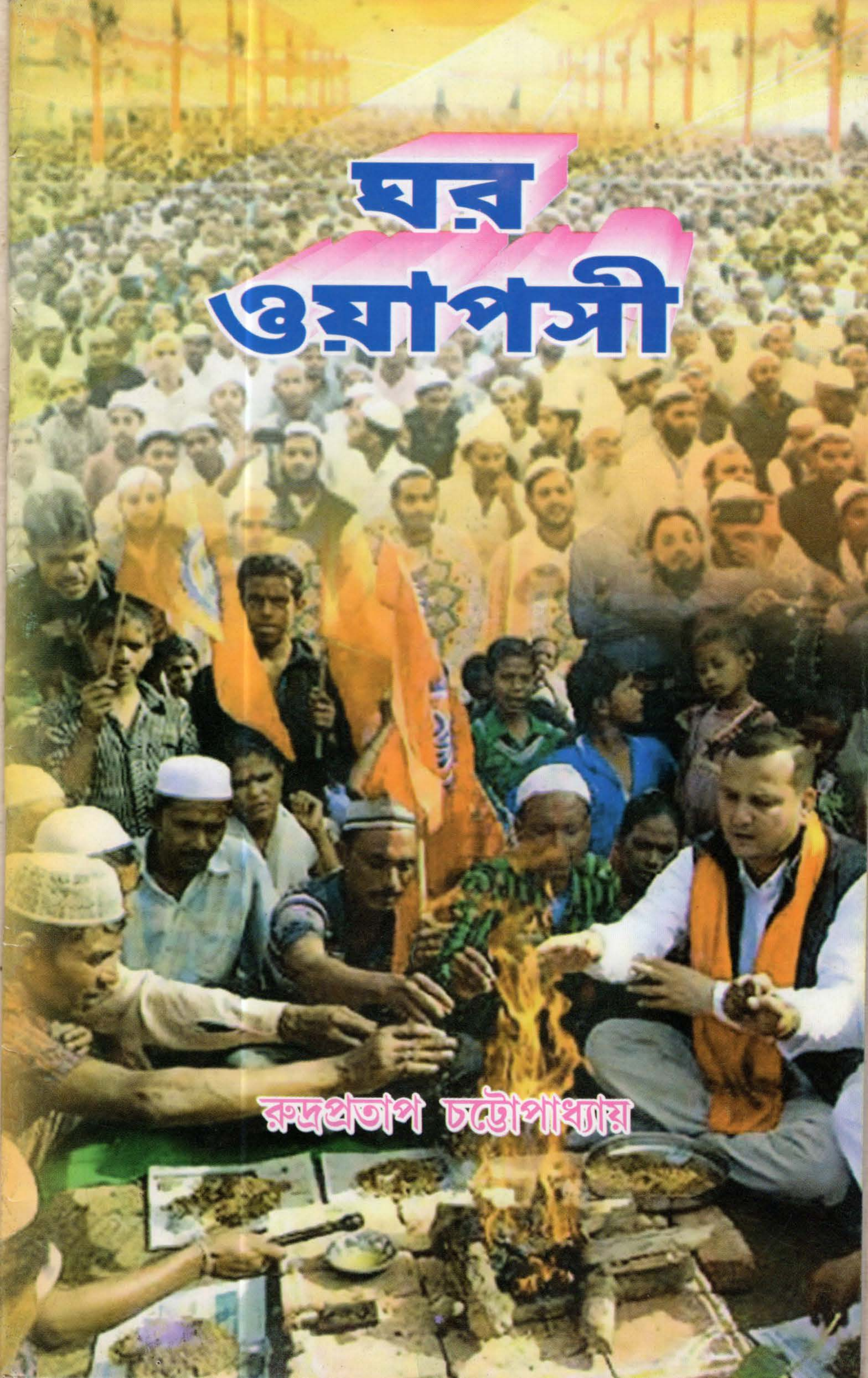
ঘর ওয়াপসী



রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

ঘর
ওয়াপসী

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
গীতিকা মাইতি
তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
অক্ষর বিন্যাস ঃ লেখক
প্রকাশকাল ঃ দুর্গাপূজা, ১৪২২
মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬
মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান
(১) তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
(২) দে বুক স্টোর, ১৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০৭৩
(৩) বাংলাদেশের পুস্তকালয়রা বইয়ের জন্য খোঁজ করবেন
'বুক সেন্টার', ৭৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২

নিবেদন

অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের আগে ভারতবাসীরা কখনও দমন-পীড়নমূলক ধর্মের সম্মুখীন হয় নি। যদিও চতুর্থ শতাব্দীতে কিছু খ্রিষ্টান মালাবার উপকূলে বসবাস করতে শুরু করেছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে ভাস্কো ডা গামার উপস্থিতিতে তারা প্রথম তাদের সেমীয় বিষদাঁত দেখায়। দুটি ধর্মই গায়ের জোরে ধর্মান্তরে বিশ্বাসী। ইসলাম ধর্মে প্রতিমাপূজকদের হত্যা করাই বিধান। কিন্তু পরে চারটি স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয় মুসলমানদের করণীয় নির্দ্ধারণের জন্য। দুটি স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিমাপূজকদের হত্যা থেকে রেহাই দিয়ে পরিবর্তে জিজিয়া নামক আক্কেলসেলামী কর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। অন্য দুটি স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিমাপূজকদের হত্যার বিধানই আছে। মোগল যুগে আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বে জিজিয়া কর নেওয়া হতো না। কিন্তু আউরঙ্গজেবের রাজত্বে জিজিয়া কর নেওয়া পুনরায় শুরু হয়। হজরত মুহাম্মদের আমলে আরব ভূমিতে নজরান নামক স্থানে কিছু খ্রিষ্টান বাস করতো। একদিন তাদের মুসলমান হবার আদেশ দিয়ে মুহাম্মদ কিছু সৈন্য পাঠালেন। খ্রিষ্টানরা জানালো তারা মুহাম্মদকে প্রচুর সম্মান করে। মুহাম্মদের জন্য তারা অনেকটা রূপা ও সৈন্যদের জন্য তারা অনেকগুলি লৌহবর্ম দিল। মুহাম্মদ এই খবরে অসন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বছরে বছরে আরও রূপা চাইলেন, এবং প্রতিটি যুদ্ধের আগে আরও লৌহবর্ম চাইতে লাগলেন। এই ভাবে বার বার চাপ বাড়িয়ে ধীরে ধীরে খ্রিষ্টানদের গরীব করে দিয়ে শেষে তাদের মুসলমান হতে বাধ্য করলেন। এই ভাবে জিজিয়া করের জন্ম হলো এবং জিজিয়া কর পরিশোধ করতে না পারলে সবাইকে মুসলমান হতে হতো।

খ্রিষ্টধর্মও আগুন ও তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে খ্রিষ্টধর্ম শান্তির পোষাক পরেছে। এখন এ দেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিত হয় মিশনারী নামক এক ধরণের প্রচারকের মাধ্যমে। তাদের প্রধান লক্ষ্য, এ দেশে ছড়িয়ে থাকা সহজ সরল আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করা। এর জন্য বিদেশ থেকে, বিশেষ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোটি কোটি টাকা আসে। খ্রিষ্টানরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, আদিবাসীরা ভূত প্রেতের উপাসক। মিশনারীদের দ্বিতীয় লক্ষ্য তপশিলীভুক্ত জাতিরা। এরা যদি খ্রিষ্টান হয় তবে তপশিলী জাতির প্রাপ্য

সরকারী সুযোগ সুবিধা পায় না। সে জন্য এরা গোপনে খ্রিস্টান হয়ে একদিকে মিশনারীদের কাছ থেকে সুবিধা পায়, অন্য দিকে সরকারী সুবিধাও গ্রহণ করে। সুতরাং লোক গণনায় যতো খ্রিষ্টানের সংবাদ পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী খ্রিষ্টানদের সংখ্যা। অন্য দিকে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে বাস করে না; তাদের গ্রাম বা পাড়া আলাদা। সে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকই জন গণনার কাজ করে। তারা সাধারণত গণনার সময় কিছু কম লোককে গণনা করে। যাতে মুসলিমদের সত্যকারের সংখ্যা বোঝা না যায়। আমাদের এক তরুণ বন্ধু দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলির কাছে একটি ব্লকের বিডিও ছিলেন। জনগণনার কাগজ পত্র দেখতে গিয়ে তিনি দেখলেন একটি গ্রামে কিছু হিন্দু ছিল একদা, কিন্তু এখন নেই। সেই গ্রামে গিয়ে অধিবাসীদের প্রশ্ন করে তিনি জানলেন, সেই গ্রামে কোনও দিনই কোন হিন্দু বা খ্রিষ্টান ছিল না। তখন তিনি জনগণনাকারীকে ডাকলেন। তিনি ঐ গ্রামেরই বৃদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষক। প্রশ্ন করতে তিনি স্বীকার করলেন যে ঐ গ্রামে কোনও দিনই কোনও হিন্দু ছিল না। তবে হিন্দু কোথা এলো ? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুখ নীচু করে রইলেন।

সুতরাং ২০১১ সালের জনগণনার ফল দেখে আমাদের আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। খ্রিষ্টানদের বৃদ্ধির হার বাড়েনি, এটা একটা প্রচণ্ড মিথ্যা কথা। এখন নাম দেখে খ্রিষ্টানদের চেনা যায় না। বহু তপশীলিভুক্ত জাতির লোক নাম পাল্টায় না, বাইরের লোকের কাছে স্বীকার করে না খ্রিষ্টান বলে।

এমত পরিবেশে আমাদের প্রথমত যত্নবান হতে হবে, আমাদের মেয়েরা যেন কোনও মুসলমানদের দিকে ধাবিত না হয়। আজকালকার সিনেমায় বা টিভি সিরিয়ালে দেখা যায় হিন্দু মেয়ে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করছে, উল্টোটা—মুসলিম মেয়ে হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করছে, এটা কখনও দেখানো হয় না। কারণ, সে ক্ষেত্রে ভয় আছে ছুরি খাওয়ার। কোনও মুসলিম অভিনেত্রী আজ পর্যন্ত কোনও হিন্দুকে বিয়ে করেনি। এমনকি কিশোর কুমারের মতো গায়ক-অভিনেতাকেও মধুবালাকে বিয়ে করার জন্য মুসলমান হতে হয়েছিল। মুসলমান যুবকেরা যাকে বলে 'ম্যাচো' (ভীমপৌরুষ); তারা সহজেই হিন্দু মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারে। আজকাল বহু ক্ষেত্রেই মুসলমান ছেলেরা হিন্দু নাম গ্রহণ করে। বা মিন্টু, বাবু, বাবুসোনা ইত্যাদি নাম গ্রহণ করে। সুতরাং কোনও ছেলের সঙ্গে আলাপ করার সময় মেয়ে যেন তার পুরো নাম জিগেস করে। এসব দিকে অভিভাবকদের দৃষ্টি দিতে হবে। প্রতিটি মেয়েই দেশের ভবিষ্যত মা। মায়ের সংখ্যা যেন কমে না যায়।

ঘর ওয়াপসী ঠিক ব্যাক্তিগতভাবে চর্চার করার কাজ নয়। তবুও হাতের কাছে কোনও সুযোগ এলে সবাই যেন যথাব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যে কোনও ভারতীয় ধর্মে প্রার্থীকে ধর্মান্তর করেন বা করতে সাহায্য করেন। নিবেদন ইতি,

জলপাইগুড়ি — রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

২রা অক্টোবর, ২০১৫

ঘর ওয়াপসী

প্রস্তাবনা

'ঘর ওয়াপসী' শব্দ-বন্ধের অর্থ ঘরে ফেরানো। ভারতের ভূমির ধর্মসমূহ হলো হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্ম। এছাড়া আছে আদিবাসীদের ধর্ম, যে গুলির বিশ্বাস সমূহ হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের অনুবর্তী। মধ্য প্রাচ্য থেকে আগত শিকারী সেমীয় ধর্মসমূহ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা বলিয়ান হয়ে ভারতের আদি মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছে এবং করছে। এইসব ধর্মান্তরিতদের পুনরায় ভারতীয় ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আনার নাম ঘর ওয়াপসী।

উনিশ শতকে কলকাতার হিন্দু সমাজের প্রমুখ নেতা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রথম হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে পতিত হয়ে যাওয়া মানুষদের ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের স্থাপিত 'পতিতোদ্ধারিণী সভাই প্রথম কিছু মানুষকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিল প্রায়শ্চিত্ত করে। ব্রিটিশ ভারতের মানুষদের এর থেকে বেশী কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এর থেকে বেশী পতিত উদ্ধার করা সম্ভব। সেই পতিত উদ্ধার করা করার জন্য হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের উদ্‌বোধিত করার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত হলো এর জন্য সবচেয়ে আগে আমাদের জানা উচিত মধ্য প্রাচ্যের শিকারী ধর্মগুলির উৎস ও চরিত্র।

ইহুদী ধর্মের অভ্যুদয়ের আগে প্রতীক ও প্রতিমার পূজা প্রচলিত ছিল পৃথিবীর সর্বত্র। বিধাতার নানা মহিমাকে নর বা অন্যান্য জীব, জন্তু, বৃক্ষ বা পাথরে রূপান্তরিত করে পুজা করার প্রথা ছিল পৃথিবীব্যাপী। মিশরের ফ্যারাও (সম্রাট) চতুর্থ অ্যামেনথ্রপ প্রথম এই প্রতিমাপূজার সংস্কৃতির বিরোধিতা করেন। সে সময়ে মিশরের সবচেয়ে বেশী পুজিত দেব ছিলেন সূর্যদেবতা আমন। এই সূর্যদেবতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিমাও ছিল। সেই প্রতিমা পূজিত হতো মন্দিরে মন্দিরে। ফ্যারাও চতুর্থ অ্যামেনথ্রপ স্থির করলেন তিনি কিছু ধর্মীয় সংস্কার করবেন। একাধিক দেবতার বদলে প্রবর্তন করবেন একটিমাত্র দেবতার পুজা। আবার, দেবতার নররূপারোপ করে সেই দেবতারও পূজা হবে না। পূজা হবে একটি প্রতীকের। তিনি সূর্যকেই দেবতা বলে মানলেন। কিন্তু সূর্যের নররূপারোপিত মূর্তি আমনকে মানলেন

না। তার বদলে স্থির করলেন একটি চাক্তিই হবে সূর্যের প্রতীক। তাঁর নাম অ্যাটন। তিনি নিজের নামটা পরিবর্তন করে রাখলেন আখেনাতন। এইরকম পাথরের চাক্তিই বসানো হলো নবনির্মিত সব মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে। আর অন্ধকারে পড়ে রইল আমন প্রমুখ দেবতার মন্দির। আখেনাতন একটি নতুন রাজধানী নির্মাণ করলেন। সেখানে বহু মন্দির তৈরী হলো; তাতে রইল অনেক অ্যাটন। কিন্তু মিশরের মানুষ আখেনাতনের এইসব ধর্মীয় সংস্কার মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি। আখেনাতনের মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে তারা ফিরে যায় পূর্বতন প্রতিমা পূজায়।

আখেনাতনের মৃত্যুর প্রায় দুশো বছর পরে এক মিশরীয় রাজপুরোহিতের মাথায় প্রবেশ করে প্রতীক-প্রতিমা পূজার অবসান ঘটিয়ে একটিমাত্র দেবতার পূজা প্রবর্তন করার চিন্তা। এই রাজপুরোহিতের নাম মোজেস। তিনি আখেনাতনের ভাবনাচিন্তা বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে আখেনাতনের ব্যর্থতার কারণ হলো তাঁর দেবতা ছিলেন শান্তিকামী। সেজন্য মানুষ তাঁকে ভক্তি করতো, কিন্তু ভয় করতো না। ভক্তির সঙ্গে ভয় মিশ্রিত না করলে মানুষ সেই দেবতাকে চিরকাল আরাধনা করে না। তিনি এমন একটি দেবতা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন, যে দেবতা একক এবং ভয়ানক। সমকালে মিডিয়াবাসীদের দেবতা ছিল আগ্নেয়গিরির দেবতা ভলক্যান। ভলক্যান একক এবং ভয়ঙ্কর। তিনি স্থির করলেন, তাঁর দেবতা ভয়ঙ্কর হবে। সবাই তাঁকে ভয় করবে। কেউ তাঁর মূর্তি নির্মাণ করবে না বা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে আছে এমন কিছুর প্রতিমা নির্মাণ বা চিত্র অঙ্কিত করে আরাধনা করবে না। তিনি তাঁর বাঞ্ছিত দেবতার নাম দিলেন যিহোভা। কিন্তু কারা এই যিহোভার পূজা করবে? নিশ্চয় মিশরীয়রা নয়। তাঁর এ হেন প্রয়াসে অবশ্যই বাদ সাধবেন ফ্যারাও।

সেই সময় ইস্রায়েলীরা মিশরে ক্রীতদাস হয়ে ছিল। তিনি স্থির করলেন, ইস্রায়েলীদের নিয়ে গোপনে সমুদ্র পার হয়ে তিনি ইস্রায়েলে উপস্থিত হবেন। ইস্রায়েলই হবে তাঁর বাঞ্ছিত ভূমি যেখানে তিনি প্রচার করবেন তাঁর নতুন ধর্মমত। একদিন গোপনে তিনি ইস্রায়েলীদের নিয়ে উধাও হলেন মিশর থেকে। সমুদ্র পার হয়ে পৌঁছলেন সিনাই উপদ্বীপে। সেখানে তাঁর বিধাতা যিহোভা আগুনের শিখা হয়ে দেখা দিলেন তাঁকে। তিনি মোজেসকে দশটি উপদেশ দিলেন। তার মধ্যে আছে: আমাকে ছাড়া অন্য কোনও দেবতাকে পূজা করবে না। পৃথিবীর কোনও কিছুর প্রতিমা নির্মাণ করবে না। তোমরা অন্য কোনও বিধাতার পদতলে নতহবে না। বা, তাদের সেবা করবে না। কারণ, আমি তোমাদের প্রভু বিধাতা, একজন ঈর্ষাপরায়ণ বিধাতা। আমি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করিনা।

এই আদেশের একদিকে রয়েছে প্রতীক-প্রতিমা পূজার বিরোধিতা, অন্যদিকে রয়েছে বহুদেবতার বদলে একমাত্র দেবতার আরাধনার কথা। এই একদেবতা অবশ্যই যিহোভা। দশটি প্রত্যাদেশের মধ্যে রয়েছে যিহোভার ভয়ঙ্কর রূপও। প্রত্যাদেশে যিহোভা বলেছেন:

আমাকে যারা ঘৃণা করে তাদের তৃতীয় পুরুষ, চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত আমি শাস্তি দিই, আমাকে যারা ভালোবাসে এবং আমার নিয়ম মেনে চলে তাদের হাজার পুরুষ পর্যন্ত আমি ভালোবাসি।

এর পরেই এই একচ্ছত্রতাবাদী বিধাতা প্রতিমাপূজকদের হত্যা করতে বললেন। তার পর প্রভু ইস্রায়েলীদের বললেন যে তোমরা আমার 'মনোনীত জন'। তোমাদের জন্য আমি বরাদ্দ করেছি 'প্রতিশ্রুতভূমি' কানান প্রদেশ। ঐ ভূমি দুধ আর মধুতে পূর্ণ। কিন্তু, ঐ ভূমি তোমাদের জয় করতে হবে তরবারির তীক্ষ্ণতায়।

এইভাবে ইহুদী বিধাতা পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে ভাগ করে ফেললেন। এক দল বিধাতার *মনোনীত জন*, অন্যদল বিধাতার *মনোনীত জন* নয়। একদল যিহোভাকে তাদের বিধাতা বলে স্বীকার করে, অন্য দলের বিধাতা ভিন্ন। এই ভিন্ন দেবতা প্রতিমার রূপও পরিগ্রহ করতে পারেন। এইভাবে এক একবিধাতাবাদের সৃষ্টি হলো, যে বিধাতা পৃথিবী থেকে প্রতিমাপুজা উচ্ছেদের জন্য প্রবলভাবে তৎপর।

এর পর মোজেস ও তার সহকারী জোসুয়া ব্যাপক হিংস্রতার দ্বারা কানান প্রদেশ জয় করলেন। বাইবেল গবেষকদের মতে মোজেস ও জোসুয়ার কানান বিজয়ের বীভৎস বিবরণ অতিকথা মাত্র। মোজেসের সময়ের অন্তত ছ-সাত শো বছর পরে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশ লেখা হয়। হয়তো মোজেসের অনুগামীরা কানান প্রদেশে অন্যদের সঙ্গে শান্তিপুর্ণভাবেই বাস করছিল। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে যিহোভা উপাসনা প্রবর্তিত হয়। পরে রাজনীতির বাস্তব প্রয়োজনে বাইবেলের রচয়িতারা কানান দখলের বীভৎস বিবরণ বাইবেলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন।

ইহুদীধর্ম নিবদ্ধ ছিল ইহুদীদের কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেই। সুতরাং ইহুদীধর্ম অন্যদের ধরে ধরে ইহুদীতে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে নি। কিন্তু, পরবর্তীকালে যিহোবার দশটি প্রত্যাদেশ, প্রতিমাপুজা বিরোধিতা ও বিধাতার আপনজন-পরজন তত্ত্বের ভিত্তিতে যে দুটি ধর্ম সৃষ্টি হয় তারা অন্যদের ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী। এই দুটি ধর্ম হলো খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম। ইহুদী ধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম এই তিনটি ধর্মকে সেমেটিক ধর্ম বা সেমীয় ধর্ম বলা হয়। কারণ, এই ধর্ম তিনটি এসিয়া মাইনর বা মধ্যপ্রাচ্যের একই অঞ্চলে সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলটি শেমের দেশ নামে পরিচিত। এই শেম ছিলেন বাইবেলের বিখ্যাত নোয়ার পুত্র। শেমের দেশে সৃষ্টি হওয়ার কারণে ধর্ম তিনটির সাধারণ নাম সেমেটিক ধর্ম বা সেমীয় ধর্ম। খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ইহুদীধর্মের পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করলেও এ দুটি ধর্মেরও ভিত্তি যিহোভার যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ। আব্রাহাম নামক এক দেবদূতের দুই পুত্র আইজ্যাক ও ইসমায়েলের বংশ থেকে যথাক্রমে খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামের জন্ম। যিশুখ্রিষ্টের জন্ম আইজ্যাকের বংশে আর হজরত মুহাম্মদের জন্ম ইসমায়েলের বংশে।

এই নতুন ধর্মদুটিও পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে দুটি পরস্পরবিরোধী বিভাগে ভাগ করে নেয়। ইহুদীরা যারা ইহুদী নয়, তাদের বলে জেন্টাইল। খ্রিষ্টানরা যারা খ্রিষ্টান নয় তাদের বলে

জেন্টাইল। আর, প্রতিমাপূজকদের সাধাবণভাবে বলে পেগান, আর ঘৃণা ভরে বলে হিদেন। মুসলমানরা অমুসলমানদের বলে কাফের। আর যারা প্রতিমাপূজক, তাদের বলে মুশরিক। মুশরিকরা অত্যন্ত ঘৃণ্য। এই দুটি ধর্মেই সমস্তরকম বিরোধীশূন্য পৃথিবী গড়ার কথা আছে। এই রকম নিরঙ্কুশবাদী ধর্ম মানব সভ্যতার কাছে মূর্তিমান ত্রাস ছাড়া কিছু নয়।

ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে মধ্যযুগে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কথা জানা ছিল না। বিভিন্ন অভিযাত্রীদের জীবনপণ অভিযানের ফলে আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ আবিস্কৃত হয়। এই সমস্ত জায়গায় সেখানকার আদিবাসীরা বাস করতো। উত্তর আমেরিকায় বাস করতো দু শো পঞ্চাশটি আদিজাতি। ইউরোপ থেকে আগত অভিযানকারীরা তাদের ধরে ধরে হত্যা করে দখল করে উত্তর আমেরিকা। অস্ট্রেলিয়া প্রধানত মরুভূমির দেশ। শুধু সমুদ্রতীরবর্তী কিছু অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া বিরাজমান। সেজন্য ঐ সব অঞ্চল ও টাসমানিয়া দ্বীপ বসবাসের পক্ষে মূল্যবান। ইউরোপ থেকে আগত সাদা চামড়ার অভিযানকারীরা আদিজাতিদের নির্বিচারে হত্যা করে ঐসব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল দখল করে। এইসব অমানবিক কাজকর্ম করতে ইউরোপীয়দের ধর্মবোধে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে নি। কারণ, ঐসব আদিজাতিরা খ্রিষ্টান ছিল না।

ভারতের অধিবাসীরা মূলত অসেমীয় ধর্মাবলম্বী। এখানে বিদ্যমান হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইহুদী ও পার্সী ধর্মাবলম্বীরা। সিংহভাগ মুসলমানরা দেশভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে সেখানেই বাস করে। পাকিস্তানের সৃষ্টিকর্ত্তা মুহাম্মদ আলি জিন্না চেয়েছিলেন দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে জনবিনিময়ও। যাতে ভারতের সব মুসলমানই পাকিস্তানে বাস করে ইসলাম সম্মত জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু ইসলামি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান জাতির পিতা সে প্রস্তাব নাকচ করেন । যদিও জাতির পিতা দাবী করতেন তিনি কুরআন পড়েছেন। ফলতঃ ভারত আজও ইসলামি সন্ত্রাস দ্বারা গ্রস্ত। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গীতে পৃথিবীটা কতকগুলি দার-উল-ইসলাম (ইসলামের দেশ)ও দার উল হরবে (ইসলামের শত্রুর দেশ)বিভক্ত। ইসলামি রাজত্বকালীন ভারত ছিল *দার উল ইসলাম* বা ইসলামের দেশ। কিন্তু ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লী দখল করার সঙ্গে সঙ্গে দেশটা *দার উল হরব* বা ইসলামের শত্রুর দেশ হয়ে যায়। তখন দিল্লীর বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত শা ওয়ালিআল্লার পুত্র শা আবদুল আজিজ দেশটি *দার উল হরব* হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালে বৃটিশের ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। ফলে ভারত *দার উল হরব* ই থেকে যায়। পাকিস্তান হয় *দার উল ইসলাম*। ভারতের সঙ্গে থেকে যায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর। কাশ্মীর দখল করার জন্য পাকিস্তান বার বার চেষ্টা করে। ফলে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের

কয়েকবার যুদ্ধও হয়। কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের মানসিকতা নিয়ে বাস করে। কারণ, কুরআন এ আছে, অবিশ্বাসীদের বশ্যতা স্বীকার করবে না। তাদের সঙ্গে কুরআনের সাহায্যে যুদ্ধ করবে। অর্থাৎ, জেহাদ করবে।

ভারত আজ খ্রিষ্টীয় আগ্রাসন দ্বারাও গ্রস্ত। অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী, তখন ভারতে এসেছিলেন পোপ জন পল। তিনি অটলজীকে পাশে রেখে ঘোষণা করলেন বিংশ শতাব্দীতে গোটা আফ্রিকাকে 'ফসল তোলা' হয়েছে, একোবিংশ শতাব্দীতে ফসল তোলা হবে দক্ষিণ এসিয়াকে। খ্রিষ্টীয় মৌলবাদীরা মনে করে খ্রিষ্টের দেশ না হওয়া পর্যন্ত একটি দেশ শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে; খ্রিষ্টের দেশ হওয়াটাই তাদের স্বাভাবিক পরিণতি।

আজকের আফ্রিকাবাসীরা আর তাদের আদিম ধর্ম পালন করে না। তারা আজ হয় মুসলমান না হয় খ্রিষ্টান। ফলে বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে দাঙ্গাও লেগে থাকছে।

আজ কাশ্মীরের মুসলমানরা দেশটিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সক্রিয়। স্বাধীনতার সময় কাশ্মীরে সাত শতাংশের মতো পণ্ডিত নামধারী ব্রাহ্মণরা বাস করতো। অন্য জাতির হিন্দুরা কাশ্মীর উপত্যকায় থাকতো না। সেই পণ্ডিতদের কাশ্মীর উপত্যকা থেকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে ভারতের সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

ধর্মান্তকরণ নতুন কিছু নয়

প্রথমেই বলা হয়েছে প্রাচীন পৃথিবীর মানুষরা নানা রকম প্রতীক ও প্রতিমার পূজা করতো। প্রতীক ও প্রতিমার ভিন্নতার কারণে তাদের মধ্যে নিজ নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বাদানুবাদ চলতোই। তারা এই নিয়ে নালিশ জানাতো রাজা বা দলপতিদের কাছে । তবে এ ঝামেলা ছিল নিতান্তই খুচরো। এ নিয়ে কোনও ব্যাপক খুনোখুনি হতো না। আবার দেবতার প্রতি আনুগত্যও মাঝে মাঝে পাল্টে যেত নানা কারণে। একদেশ থেকে অন্য দেশে গেলে সেখানকার প্রচলিত দেবতার অনুগত হতো তারা। যেমন ধরা যাক শক হুনদের কথা । তারা তো বাইরে থেকেই এসেছিল এ দেশে। তাদের নিশ্চয় অন্য উপাস্য দেবতা ছিল। কিন্তু এ দেশে থাকতে থাকতে তারা ক্রমশঃ হিন্দু হয়ে গেছে। এখন আর তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই; অস্তিত্ব নেই তাদের স্বতন্ত্র উপাস্যের। হুনদের যাযাবর অংশ গুজর নামে পরিচিত। তারা শেষ পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। শেষে মিশে যায় অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে। তাদেরই বসতি অঞ্চল থেকে গুজরাট, গুজরানওয়ালা, গুরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলের নাম করণ হয়। পার্সীরা তো ভারতে এসেছিল সপ্তম শতাব্দীতে। আজকে ভারতে তারা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক সম্প্রদায় ও পৃথিবীর প্রাচীন অগ্নিউপাসক সম্প্রদায়ের একমাত্র নমুনা।

চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ও নাগর ব্রাহ্মণরাও বাইরে থেকে এসেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অসমে এসেছিল অহোমরা। তারাও কালক্রমে হিন্দু হয়ে গেছে। তাদের পৃথক সত্তা আর নেই।

এই যে বিভিন্ন জাতির মানুষ ভারতবর্ষে এসে বসবাস করতে করতে এখানকার মানুষদের সঙ্গে মিশে গেছে, এদের নিজস্ব ভাষা ছিল, সেই ভাষায় ছিল নাম, ছিল নিজস্ব উপাস্য দেবতা। কিন্তু আজকের ভারতে আর তারা সে ভাষায় কথা বলে না, তাদের সেইসব নাম আর নেই। নেই তাদের সেইসব উপাস্য দেবতারাও। তাদের আজ পৃথক করে শনাক্ত করার কোনও উপায়ও নেই। ধর্মের দিক দিয়ে তারা আজ সব হিন্দু। অর্থাৎ তারা ইতিহাসের এক অজানা মুহূর্তে নিজেদের ধর্মীয় সত্তা, ভাষা সত্তা পরিবর্তন করে হিন্দু হয়ে গেছে। এই ধর্মীয় পরিবর্তন তাদের পক্ষে তেমন কষ্টকর ছিল না; কারণ তারা কেউই কট্টর সেমীয় ধর্মাবলম্বী ছিল না। তাদের চোখে ঘৃণ্য ছিল না ভারতের ধর্মাবলী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মান্তরকরণ ভারতের ইতিহাসে নূতন কোনও ঘটনা নয়। এটি আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। যে সব ধর্মান্তরকরণ প্রাচীন যুগে চলতো তার মধ্যে একটা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার ছিল। যারা ধর্মান্তরিত হতো তাদের কিছু আচার-আচরণ ও পরম্পরা ভারতের ধর্মেও গৃহীত হতো। কিন্তু সেমীয় ধর্মগুলি ভারতের মাটিতে একটুও মেশে নি। তারা এই দেশে সেমীয় ঈশ্বরের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেজন্য এ দেশের যাবতীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করা তাদের একান্ত ও অন্তিম উদ্দেশ্য।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম তার থেকে প্রতীয়মান যে সেমীয় ধর্মগুলি একচ্ছত্রতাবাদী; তারা ভারতীয় ধর্মাবলীর শত্রু এবং তারা ভারত জুড়ে নিজ নিজ সেমীয় বিধাতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাদের ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা গেছে, অতীতে তারা ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছে বিশ্বজুড়ে এবং পৃথিবীর প্রতিমা-প্রতীক পূজারীদের নিঃশেষে হত্যা করে তাদের সুপ্রাচীন সভ্যতাকে ধূলায় লুটিয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র আজকের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আড়াশোটি আদিজাতি ছিল। তারা আজ আর জীবিত নেই। কেবলমাত্র মিউজিয়ামের সামগ্রীর মতো সেই পুরাতন জাতিগুলির নমুনা হিসাবে কিছু রেড ইন্ডিয়ানকে এখন সে দেশে দেখা যায়।

মুসলমানরা অতীতে ধর্মান্তরকরণের জন্য তরবারীর শক্তি বা জিজিয়া কর ব্যবহার করতো। চড়াহারে জিজিয়া কর না দিতে পারার জন্য ইসলামায়িত হতে বাধ্য হতো বহু লোক। কিন্তু খ্রিষ্টানরা বলপ্রয়োগ ছাড়াও মিশনারী বা ধর্মপ্রচারকের দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসার করে। এইসব মিশনারীরা মানুষকে খ্রিষ্টায়িত করে শিক্ষাবিস্তার ও সেবাকাজের মাধ্যমে। কীভাবে তারা শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষকে খ্রিষ্টায়িত করে, তা উনিশ শতকের মিশনারী আলেকজান্ডার

ডাফের কীর্তিকলাপ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। সেই সময় উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা কয়েকজন নিম্নজাতির মানুষকে টাকা পয়সা সহযোগে খ্রিষ্টান করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ডাফই প্রথম খ্রিষ্টীয় মিশনারী যিনি কিছু উচ্চবর্ণের মানুষকে খ্রিষ্টান করতে সমর্থ হন। আলেকজান্ডার ডাফের পিতা তাঁকে বলেছিলেন, ভারতের মানুষরা খুব পাপের মধ্যে আছে। কারণ, তারা প্রতিমাপূজক। ডাফ ভারতে আসেন এই 'পাপের মধ্যে থাকা' ভারতীয়দের 'উদ্ধার' করতে। তিনি রামমোহনের সাহায্যে বিদ্যালয় খুলে বিদ্যালয়ে পড়তে আসা কোমলমতি ছাত্রদের মগজধোলাই করে তাদের খ্রিষ্টায়িত করতে মনস্থ করলেন।

ঘর ওয়াপসী

এই প্রসঙ্গেই আসে 'ঘর ওয়াপসী' শব্দটি। এর বিপরীত শব্দটি হলো 'ঘর ভাঙ্গা'। এই শব্দবন্ধ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্র জনক দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। সে সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মদতে মিশনারীরা হিন্দুদের ধর্মান্তর করছিল। ধর্মান্তরের নেতা ছিলেন উপরোক্ত মৌলবাদী আলেক জান্ডার ডাফ। একদিন সকালে দেবেন্দ্রনাথের জমিদারী সেরেস্তার সরকার মশাই তাঁর কাছে কেঁদে পড়লেন। তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই ডাফ সাহেবের স্কুলে পড়তো। মিশনারী ডাফ সাহেব তাঁর সেই ভাইকে ও তার বালিকা বধূকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। এইভাবে হিন্দু পরিবারের সদস্যকে খ্রিষ্টান করে পরিবারবহির্ভূত করে দেওয়া, এটাই হচ্ছে দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় 'ঘর ভাঙ্গা'। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে ডাফের মৌলবাদী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার শুরু করেন। ফলে ধর্মান্তরের স্রোত স্তিমিত হয়ে যায়। বিষণ্ণ ডাফ ফিরে যান দেশে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অসম্পূর্ণরূপে ইসলামায়িত হিন্দুদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। পরে বিংশ শতাব্দীতে এই শুদ্ধি আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে আর্যসমাজী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে মুসলমানরা।

আগেই বলেছি, 'ঘর ওয়াপসী' খ্রিষ্টান মিশনারী ও মুসলিমদের কৃত ঘর ভাঙ্গারই বিপরীত শব্দবন্ধ। 'ঘর ওয়াপসী' বর্তমানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঘোষিত একটি কার্যক্রম। প্রথমেই বলে রাখি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'হিন্দু' শব্দের অর্থ হিন্দুস্থানের অধিবাসী। এর মধ্যে ধরা হয় নি খ্রিষ্টান, মুসলমান ও কমিউনিষ্টদের। উনিশশো চৌষট্টি সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গঠিত হয় চিন্ময় মিশনের স্বামী চিন্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে। সেই সভায় শিখ নেতা তারা সিং যেমন যোগ দিয়েছিলেন, তেমনই যোগ দিয়েছিলেন দালাই লামা। পরিষদ ধর্মান্তরিত করে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী শিখ, বৌদ্ধ, জৈন বা হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনে। আদিবাসীরা চাইলে তাদের চিরাচরিত ধর্মে ফিরে যেতে পারেন। সুতরাং 'ঘর ওয়াপসী' কখনই সবাইকে হিন্দুধর্মে নিয়ে আসার ব্যাপার নয়। কোনও অনিচ্ছুককে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারও নয়।

ভারতের মানুষদের সমস্যা সেমীয় ধর্ম নিয়ে। আগেই বলেছি, এগুলি একচ্ছত্রতাবাদী ও মানুষকে 'আমরা-ওরা' তে বিভক্ত করে। 'আমরা' সেমীয় বিধাতার আপনজন। অন্যরা 'পরজন'। পরজনদের লোপাট করে 'আপনজন'দের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই সেমীয় ধর্মগুলির অন্তিম উদ্দেশ্য। সেই লোপাট করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ধর্মান্তর করে। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যিশু পুনরায় জন্ম নেবেন যখন পৃথিবী কানায় কানায় ভরে উঠবে খ্রিষ্টানে। আর মুসলমানরা বিশ্বজুড়ে আল্লাহ্‌র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ভারতের মাটিতে দুটি ধর্মই বিচ্ছিন্নতাবাদী। আগেই বলেছি, দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় কাশ্মীর উপত্যকাতে সাত শতাংশের মতো পণ্ডিত নামধারী হিন্দু ব্রাহ্মণ বাস করতো। তাদের আগুন ও রক্তের মধ্যদিয়ে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। আর পঞ্চাশের দশকে এ জেড ফিজো নামক এক খ্রিষ্টানের নেতৃত্বে নাগারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করে। ফলে ভারত সরকারকে বহুদিন ধরে যুদ্ধ চালাতে হয় বৈরী নাগাদের বিরুদ্ধে। আজও এই নাগা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে যুদ্ধ চালাতে হয়। অন্য দিকে মিজোরামে লালডাঙ্গার নেতৃত্বে বিদ্রোহ হয়। বর্তমানের ভারতের মধ্যে মিজোরাম একটি খ্রিষ্টান রাজ্য। তারা সে দেশ থেকে অ-মিজো ও অ-খ্রিষ্টান রিয়াংদের বিতাড়িত করেছে।

শিক্ষাবিস্তার ছাড়াও মিশনারীরা বেশ কিছু হাসপাতালের মাধ্যমে 'জনসেবা' করে। সরল সহজ মানুষদের চিকিৎসা করে রোগমুক্ত করার পর তাদের বলা হয়, ওষুধ খাওয়া আসল ব্যাপার নয়, প্রভু যিশুই তোমার রোগ সারিয়েছেন। সুতরাং প্রভু যিশুর স্মরণ নাও। সম্প্রতি বিহারের ভাগলপুরের একটি গ্রামে কিছু দরিদ্র মানুষ নানারকম রোগে ভুগছিল। তাদের বোঝানো হয়, যিশুর স্মরণ নিলেই তোমাদের রোগ সেরে যাবে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের খ্রিষ্টান করা হয়। পরে তাদের বেশ কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। যে কোনও বিজ্ঞানবাদী মানুষ স্বীকার করবেন যে কোনও রোগ সারানোর জন্য ওষুধ অবশ্যই সেবন করতে হয়। অলৌকিকভাবে কারো নাম স্মরণ করলে রোগ সারে না। এইভাবে সহজ সরল মানুষকে প্রতারণা করেই মিশনারীরা চিরকাল পৃথিবীতে খ্রিষ্টানের সংখ্যা বাড়ায়। এ ছাড়া আছে মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নেওয়া। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের মধ্যে দারিদ্র্য আছে। মিশনারীরা সেই দারিদ্রের সুযোগ নেয়। দরিদ্র মানুষদের এক বস্তা চাল বা কয়েকশো টাকা দিয়ে তাদের খ্রিষ্টান করে। প্রখ্যাত প্রটেস্টান্ট মিশনারী সংস্থা 'সালভেশন আর্মি'র প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল বুথ বলেছিলেন, সেবা হচ্ছে 'চার', যা দিয়ে 'পরিত্রাণ' নামক বড়শিতে মানুষ গাঁথা যায়। বাস্তবিকই সহজ সরল মানুষরা জলের মধ্যে থাকা মাছই। মিশনারীরা তাদের নানা রকম প্রলোভন দিয়ে খ্রিষ্টানীয় বঁড়শীতে গাঁথে।

এই প্রসঙ্গেই আসে 'রাইস খ্রিষ্টান' কথাটি। এসিয়ার যে যে দেশের মানুষ ভাত খায় সেখানকার গরীব মানুষদের দুঃসময়ে কয়েক বস্তা চাল দিয়ে তাদের খ্রিষ্টান হতে বলা হয়।

শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির বিনিময়ে ধর্মান্তরিত এইসব খ্রিষ্টানকে বলা হয় 'রাইস খ্রিষ্টান'। বস্তুত চালের বস্তা দিয়ে গরীব মানুষদের ধর্মান্তর ভারতে ব্যাপকভাবে চলে। বিশেষত দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব ভারতে।

এই মানুষ কেনার ব্যবসা কেন করে মিশনারীরা? কারণ, তাদের মনের মধ্যকার সেই অন্ধ বিশ্বাস—পৃথিবী খ্রিষ্টানদের দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলে যিশুখ্রিষ্টের পুনরায় আবির্ভাব হবে। সেই খ্রিষ্টের সুখকর রাজত্ব চলবে হাজার বছর ধরে। পৃথিবীতে কেউ আর দুঃখী থাকবে না।

খ্রিষ্টানদের আর একটা মৌল বিশ্বাস হচ্ছে, প্রতি মানুষই জন্মগতভাবে পাপী। কারণ, আদিপিতা আদম ও আদিমাতা ঈভ স্বর্গের উদ্যানের সুখের মধ্যে বাস করতেন। তাঁদের মনে কোনও দুঃখ ছিল না। কিন্তু একদিন শয়তান সাপের আকারে তাঁদের কাছে গিয়ে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে পরামর্শ দিল। তাঁরা ফল খেয়ে নিজেদের যুবক যুবতীরূপে শনাক্ত করলেন। ফলে তাদের মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো। তাঁরা সন্তানের পিতা-মাতা হয়ে উঠলেন। আদম-ঈভ ও তাঁদের সন্তানরা সুখের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও পড়ে গেলেন। আদম-ঈভের এই সৃষ্টিধর্মী মিলন 'আদিম পাপ' বলে চিহ্নিত হলো বাইবেলে। প্রত্যেক মানুষই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই 'আদিম পাপ' দ্বারা গ্রস্ত হয়। কেবলমাত্র যিশুর স্মরণ নিলেই মানুষ এই 'আদিম পাপ' থেকে মুক্ত হতে পারে, এই হচ্ছে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস। আমরা হিন্দুরা কখনই এমন আজগুবি তত্ত্বের দ্বারা গ্রস্ত হতে পারি না। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা কখনই পাপ হতে পারে না। সুতরাং যিশুর স্মরণ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই।

খিষ্টধর্মের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় কেবল মাত্র যিশুই 'পরিত্রাণকর্ত্তা' এমন তত্ত্ব নিউ টেস্টামেন্টে প্রবিষ্ট করা হয় রোমক সম্রাট কনস্টানটাইনের আমলে। তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদের দোসর হয়ে দাঁড়ায় খ্রিষ্টধর্ম। কনস্টানটাইন বুঝেছিলেন সব মানুষকে একটি ধর্মের ছাতার মধ্যে এনে সেই ধর্মের উপর যদি কর্তৃত্ব করা যায়, তবে এক বিশাল সংখ্যক মানুষের উপর সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব বলবৎ থাকে। এইভাবে খ্রিষ্টধর্ম এক সাম্রাজ্যবাদী ধর্মে পরিণত হয়। উনিশ শতকে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারী মার্সম্যান বলেছিলেন যে, নবদীক্ষিত খ্রিষ্টানরা নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠবে। ফলে সরকারের পক্ষে ব্যাপারটা হয়ে যাবে সুবিধাজনক।

দেশের কোন একটা অংশে যদি খ্রিষ্টানদের ঘনত্ব যথেষ্ট বেশী হয়, তবে সেই অংশ দিল্লী কেন্দ্রিক ভারত সরকারকে নাও মেনে নিতে পারে। নাগা ও মিজোদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহের ব্যাপারটা আমরা দেখেছি। এর থেকে বোঝা যায় খ্রিষ্টানরাও মুসলমানদের মতোই বিচ্ছিন্নতাবাদী।

ভারতে খ্রিষ্টান মিশনারী আগ্রাসনের ইতিহাস

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ভাস্কো ডা গামার ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের পর থেকে এ দেশে মিশনারীদের প্রবেশ ঘটে। সোসাইটি অফ দি জেসাসের মিশনারীরা ভাবলেন দেশের রাজা জাহাঙ্গীরকে যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে খ্রিষ্টান করা যায়, তবে জাহাঙ্গীর কনষ্টানটাইনের মতো গোটা দেশকে খ্রিষ্টান করবেন। তাঁরা জাহাঙ্গীরকে খ্রিষ্টধর্ম বোঝাতে লেগে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর সুন্নি মুসলমানই রয়ে গেলেন।

বাকী সব মিশনারীরা এ দেশের মানুষের ভাষা শিখে খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক ছোট ছোট পুস্তিকা লিখে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু এ সবের বিশেষ কোনও ফল দেখা যায় নি। তার কারণ, তখন এ দেশে শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় নি। তা ছাড়া মিশনারীদের লেখা এ দেশীয় ভাষাও ছিল দুর্বোধ্য। এই জাতীয় বাংলা ভাষাকে বলা হতো 'সাহেবী বাংলা।'

পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটীশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর লর্ড ক্লাইভের হাতে বাংলার নবাব সিরাউদ্দৌলার পতনের ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। তখন থেকে কলকাতাই হয় বাঙ্গলার রাজধানী।

পলাশী যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোম্পানী এ দেশে শুধুমাত্র বাণিজ্যই করতো। এ দেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করা নিয়ে তারা কদাচ মাথা ঘামাতো না। কোম্পানীর কর্মীরাও নিজেদের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, এমনকি গীর্জাতেও যেতেন না। এ দেশের লোকেদের কোপে পড়ার ভয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টররা মিশনারী কার্যকলাপকে বিশেষ উৎসাহিত করেন নি। বিলেত থেকে আসা কোনও মিশনারী যাতে কোম্পানীর এলাকায় ঢুকে না পড়ে সে বিষয়ে ডাইরেক্টর সভার ও ভারতীয় রাজপুরুষদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দ ডাঃ টমাস নামক এক চিকিৎসক চিকিৎসা করার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করলে কোম্পানী তাঁকে কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। বাধ্য হয়ে মালদায় গিয়ে নীলের ব্যবসায় শুরু করেন তিনি। অবসর সময়ে তিনি গ্রামের লোকেদের ধর্মোপদেশ দিতেন।

১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মার্শম্যান প্রমুখ কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী ডিরেক্টরদের লাইসেন্স ছাড়াই কলকাতা পৌছলে লর্ড ওয়েলেসলী তাদের বিপ্লবী ভেবে জাহাজের মার্কিণ ক্যাপ্টেনকে তাদের কলকাতা পুলিশের হাতে অর্পণ করতে বলেন। শ্রীরামপুরের দিনেমার সরকার তাদের আশ্রয় না দিলে তাদের হয় তো ভারত ছেড়ে চলেই যেতে হতো।

কোম্পানী শুধু মিশনারীদের দূরে রাখতো না, উল্টে এদেশীদের ধর্মকর্মে উৎসাহ দেখাতো। অংশগ্রহণ করতো হিন্দু দেব দেবীর পুজা অর্চনায়। ওয়ারেন হেষ্টিংস নাকি প্রতি রবিবার কালীঘাটে পুজা দিতে যেতেন। কোম্পানী সরকার বছরে ষাট টাকার মতো পূজা দিতো কালীঘাটে। টিপু সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর কোম্পানী সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতিনিধি বিরাট শোভাযাত্রা করে কালীঘাটে গিয়ে পূজার উপচার হিসাবে দেবীকে

পাঁচ হাজার টাকা দেয়। এই সময় এবং এর পরেও সাহেবরা দল বেঁধে দুর্গাপূজায় যোগ দিত। কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা এ দেশীয় লোককে চিঠি লেখার সময় চিঠির মাথায় 'শ্রীকৃষ্ণ' লিখতে ভুলতো না। অনেক সাহেব চড়কে সন্ন্যাস পর্যন্ত নিত। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম পাদে বঙ্গদেশ মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না কিন্তু পরিবেশ অনুকূল না হলেও মিশনারীরা হাল ছাড়ার পাত্র কোনোকালেই নয়।

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংলণ্ডের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্মের আলোক বিতরণের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে খ্রিষ্টান মিশনারীদের অবাধ প্রবেশ সংক্রান্ত উইলবারফোর্সের প্রস্তাবটি হেনরী থর্নটন, প্যারী, চার্লস গ্রান্ট প্রমুখ এমপিরা সমর্থন করা সত্ত্বেও হেস্টিংস, হ্যালহেড প্রমুখের প্রবল আপত্তিতে নাকচ হয়ে যায়। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত চার্চ মিশনারী সোসাইটি ও ১৮০৪ এ প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি'র লক্ষ্যই ছিল বিদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা। লণ্ডনের বিভিন্ন চার্চ জনগণকে বোঝাতে পেরেছিল যে ভারতবাসীকে এইরকম 'অধঃপতিত' অবস্থা থেকে উদ্ধার করার নৈতিক দায়িত্ব ইংরেজদেরই। কাজে কাজেই ভারতে খ্রিষ্টজ্ঞানামৃত বিতরণের পথ যাতে সুগম হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা ব্রিটেনের জনগণের কর্তব্য। সুতরাং ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সময় ৮৩৭ টি খ্রিষ্টধর্ম প্রচার সংক্রান্ত আবেদন পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। খ্রিষ্টান মিশনারীদের ভারতে কাজ করার স্বপক্ষে উইলবারফোর্স একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে দীর্ঘ এক বক্তৃতায় বললেন, "আমাদের ধর্ম স্বর্গীয়, বিশুদ্ধ এবং উপকারী; ভারতীয় ধর্মপদ্ধতি নীচ, যৌনতাময় ও নিষ্ঠুর। এটা একটা বিশাল ঘৃণ্য ব্যাপার।"

উইলবারফোর্সের প্রস্তাব ৫৪-৩২ ভোটে গৃহীত হলো। ফলে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত সনদে দেশীয়দের পারত্রিক ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য বছরে পাঁচ হাজার পাউন্ড বেতনে গোটা ভারত সাম্রাজ্যের জন্য একজন বিশপের ব্যবস্থা হলোঙ্গ এ ছাড়া বার্ষিক দু হাজার করে ছ হাজার পাউন্ড বেতনে তিন প্রেসিডেন্সীতে তিনজন আর্চডিকনেরও ব্যবস্থা রইলোঙ্গ এই বেতন ভারতীয়দের দেওয়া রাজস্ব থেকেই সংগৃহীত হতোঙ্গ পরবর্তীকালে ভারতবাসীদের বেতনভুক আর্চডিকন ডিয়ালট্রী ডিরোজিয়ো-শিষ্যদের শিকার করার জন্য মৌলবাদী ডাফের সং। জাল পেতেছিলেনঙ্গ

এইভাবে এই প্রথম খ্রিষ্টান মিশনারীরা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলো। ফলে ১৮১৩ থেকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ঢল নামলো ভারতে। ১৭৯৩ থেকে ১৮১২ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের সংখ্যা মাত্র ১৮৮ হলেও ১৮১৩ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৪০৩ জন, ১৮২৩ থেকে ১৮৩২ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সংখ্যা ৬৭৫ জন ও ১৮৩৩ থেকে ১৮৪২ পর্যন্ত ১০৪৫ জনকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয় মিশনারীরা।

এইভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে পরাধীন, অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু ভারতীয়দের উপর খ্রিষ্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। মিশনারীরা স্বপ্ন দেখতেন রাতারাতি এ দেশের মানুষদের খ্রিষ্টান করার। যে কোনওভাবেই তারা এই স্বপ্নকে রূপ দিতে চাইতেন। উপনিবেশবাদীরা ভারতবাসীদের উৎপীড়ন করতে রাজী হতেন না। তারা ভয় করতেন বিদ্রোহের। সুতরাং তাঁরা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন মিশনারীদের কার্যকলাপের উপর।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কলকাতায় নামতে দেননি, ফলে তারা দিনেমারদের শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরী। অপর দুজন ছিলেন ওয়ার্ড ও মার্শম্যান। এঁরা সবাই বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভালোভাবে শিখেছিলেন। শিখেছিলেন অন্যান্য ভারতীয় ভাষাও। ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ ঢালাই মিস্ত্রী। তিনি বিভিন্ন ভাষার টাইপ তৈরী করেছিলেন। ফলে তাঁদের দ্বারাই প্রথম বাঙ্গলায় বই ছাপা হয়। এইসব মিশনারীদের কাজ ছিল নানারকম পুস্তিকা লিখে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের কুৎসা করা এবং খ্রিষ্টধর্মের জয়গান করা। হিন্দুরা, তাদের মতে নৈতিক শিক্ষাহীন, দুশ্চরিত্র। হিন্দু নারীদের সতীত্ব জিনিষটা নেই....ইত্যাদি নানা নিন্দা। উল্টোদিকে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রশংসা। বিভিন্ন বাইবেল ট্রাক্টে'ও ব্যাপকভাবে আক্রমণ করা হতো হিন্দুদের। ১৮৩৭ এ প্রকাশিত 'মহাপ্রায়শ্চিত্ত'তে হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র ও তীর্থমাহত্ম্যকে ব্যাপক আক্রমণ করা হয়। সমসময়ে 'ধর্ম অবতার' নামক আর একটি ট্রাক্টে হিন্দু দেবদেবী ও অবতারদের নিন্দা করা হয়।

ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের লাগাতার প্রচেষ্টার ফল ফললো। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর কৃষ্ণদাস পাল নামক এক বাঙ্গালী ছুত্রের প্রথম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলো। এই ধর্মান্তরে স্থানীয় মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করেছিল শ্রীরামপুরের দিনেমার সরকারের কাছে। জল অনেকদূর গড়ায়। মিশনারীদের রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত পুলিশী ব্যাবস্থা পর্যন্ত করতে হয়। ব্যাপারটা ভাবিয়ে তোলে লর্ড ওঁয়েলেসলীকে। পরের বছর কৃষ্ণদাসের শালী জয়মনিও খ্রিষ্টান হলো। বলা বাহুল্য, এইসব ধর্মান্তর মোটেই আদর্শগত কারণে হয়নি। নানাবিধ প্রলোভনের ফলে কৃষ্ণদাস ও তার শালী ধর্মান্তরিত হয়। আজও খ্রিষ্টানরা ভারতের মানুষদের ধর্মান্তরিত করার জন্য বস্তা বস্তা চাল ও অর্থ প্রদান করে। হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বলে, কোনও ওষুধ নয়, যিশুই তোমার রোগ সারিয়েছে। এই রকম তঞ্চকতা অতীতেও চলেছে, আজও চলছে। ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ছেদহীন তৎপরতার ফলে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় সাতশো জন মানুষ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

আলেকজান্ডার ডাফ

আলেকজান্ডার ডাফ স্কটল্যান্ডের পার্থসায়ারের এক কৃষকপুত্র। তিনি সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা ও দিব্যজ্ঞান নিয়ে পাশ করে মিশনারী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। চার্চ অফ স্কটল্যান্ড তাঁকে ভারতে মিশনারী করে পাঠায়। তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষরা পাপের মধ্যে বাস করছে। কারণ, তাঁরা পুতুল পূজা করে এবং এখনও পর্যন্ত যিশুর স্মরণ নেয় নি।

একটি ঝঞ্ঝামর জাহাজ যাত্রা শেষে ১৮৩০ সালের ২৭ শে মে তিনি কলকাতা পৌছান। প্রথমেই তিনি কলকাতার বিভিন্ন অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তারপর কলকাতার মানুষদের শিক্ষাদীক্ষার দিকে নজর পড়ে। কলকাতার মানুষরা সাহেবদের সঙ্গে কাজকারবার করার জন্য ইংরেজী শিখতে আগ্রহী। যদিও হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজীতেই লেখাপড়া করে, তবুও বহু লোক আছে যারা তাদের সন্তানদের ইংরেজী পড়াতে উৎসুক। তিনি এই সুযোগটাই নিতে চান। একটি ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল খুলে ছাত্রদের মাথা চিবিয়ে খেয়ে তাদের খ্রিষ্টান করবেন। তিনি শহরের সবচেয়ে নামজাদা মানুষ রামমোহন রায়কে ধরলেন একটি স্কুল খোলার মত্রে বাড়ী দেখে দেবার জন্য। শহরের এই উচ্চ প্রতিভাবান মানুষটি ডাফের জন্য ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীটি স্থির করলেন। একজন পাদ্রীকে বাড়ী ভাড়া ঠিক করে দেওয়ার জন্য অনেকে সমালোচনা করলেন রামমোহনের। রামমোহন বললেন, কৈ, আমাকে তো কেউ খ্রিস্টান করতে পারে নি ? ডাফের শয়তানির বহরটা রামমোহন আন্দাজই করতে পারেন নি।

ডাফ স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই স্কুলে ছাত্রও জুটতে লাগলো। ইংরেজী , ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলও পড়াতে লাগলেন ডাফ। তারপর ছাত্রদের প্রশ্ন করতে লাগলেন, তুমি কি যিশুকে ত্রাণকর্তা বলে মানো? ছাত্র যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে তাকে জর্ডন নদীর জল মাথায় ঢেলে খ্রিষ্টান করতেন।

কিন্তু, এ হচ্ছে পরের কথা। প্রথমে হিন্দু কলেজের ইংরেজী পড়া ছাত্রদের খ্রিষ্টান করার কথা চিন্তা করলেন ডাফ। কলকাতার বিশপ ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন এই ছাত্রদের কাছেই প্রথম খ্রিষ্টীয় সন্দেশ পরিবেশন করবেন। সেই অনুযায়ী তিনি একটি বাড়ী ভাড়া করলেন হিন্দু কলেজের কাছে। সেখানে একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করলেন। আর হিন্দু কলেজের ছাত্র-বান্ধব শিক্ষক ডিরোজিয়ো ছাত্রদের ঐ বক্তৃতায় যোগদান করতে পরামর্শ দিলেন। আর ছাত্ররা, যারা জানতো বসে প্রস্রাব করা বা গঙ্গায় স্নান করাটাই হিন্দুধর্ম, যারা গীতা বা বেদান্তর কথা একেবারেই জানতো না, ফলে হিন্দুধর্ম তাদের কাছে ছিল তুচ্ছতার ব্যাপার, তারা গুরু ডিরোজিওর পরামর্শ ভালো মনে করে দলবেঁধে যোগ দিল পাদ্রীদের বক্তৃতায়। হিন্দু কলেজের অভিভাবকরা, যাঁরা চেয়েছিলেন শুধুমাত্র ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষা,

যার বলে ছাত্ররা ইংরেজী শিখে সাহেবী সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম করবে, বা, সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করবে, তাঁরা ছাত্রদের মিশনারীদের দিকে ধাবিত হতে দেখে প্রমাদ গণলেন। ছাত্রদের নিষেধ করা হলো খ্রিষ্টান মিশনারীদের সভায় যোগদান করতে। ছাত্ররা আর ভিড় করলো না খ্রিষ্টান মিশনারীদের বক্তৃতা শুনতে।

উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বক্তৃতামালা বন্ধ করে দিল মিশনারীবৃন্দ। এটা একটা প্রমাণ যে ডিরোজিওর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুকলেজের তরলমতি ছাত্রদের খ্রিষ্টান করা।

সুতরাং তখন তখনই ফললাভ করলো না ডাফের প্রচেষ্টা। কিন্তু ডিরোজিও হিন্দু কলেজে বসে নিষিদ্ধ মাংস দিয়ে টিফিন খেতেন। ছাত্ররা তা দেখতো। আবার ডিরোজিওর বাড়ীতেও যাতায়াত ছিল ছাত্রদের। সেখানে তাদের আকর্ষণ ছিল ডিরোজিওর অবিবাহিতা বোন এমিলিয়া। সেখানে ছাত্ররা কি আহার করতো তা আমাদের জানা নেই। যাই হোক, হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কাজ করার নীতিতেই হয়তো ডিরোজিওর ছাত্ররা গোমাংস খেতে আরম্ভ করেছিল। একদিন ঠনঠনিয়ায় কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ীতে, তার অনুপস্থিতিতে বন্ধুরা গোমাংস খেয়ে গোহাড় ছুঁড়ে ফেললো পাশের ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। ব্রাহ্মণ নালিশ করলেন কৃষ্ণমোহনের অভিভাবকদের কাছে। ফলে কৃষ্ণমোহন বিতাড়িত হলেন বাড়ী থেকে। ডাফ তাকে আশ্রয় দিলেন এবং কৃষ্ণমোহন শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেন খ্রিষ্টধর্ম। পরে তিনিও পাদ্রী হয়ে হিন্দু সমাজের প্রভূত সর্বনাশ করতে শুরু করেন। ডিরোজিওর কু-পরামর্শে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা গোমাংস খেতে শুরু করলে ডাফ তার বইতে লেখেন, "যথেষ্ট যে শত্রুরা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে।"

কৃষ্ণমোহন ছাড়াও ডাফ বেশ কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দুকে ধর্মচ্যুত করতে সমর্থ হন।

মিশনারীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী সেরেস্তার সরকারের ভাই মহেশ চন্দ্র সরকারকে ডাফ খ্রিষ্টান করার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চুপচাপ বসে থাকলেন না। তিনি কলকাতা শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে ডাফের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সজাগ করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাফের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন নিজস্ব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে। এরপর তিনি কলকাতা শহরের ধনীদের একটি সভা আহ্বান করে হিন্দু ছেলেদের শিক্ষার জন্য একটি নতুন স্কুল খোলার প্রস্তাব রাখলেন। এই সভায় ব্রাহ্মরা ছাড়াও যোগ দিলেন সনাতন হিন্দু সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও। প্রত্যেকেই মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতে রাজী হয়ে গেলেন। এইভাবে প্রতিষ্ঠা হলো 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের'। তাঁরা নব খ্রিষ্টানদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য 'পতিতোদ্ধার সভা' নামক একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুললেন। এই সভা অবশ্য তেমন সাফল্যলাভ করতে পারে নি; সামান্য কিছু লোক প্রায়শ্চিত্ত

করে স্বধর্মে ফিরে এসেছিল। তার কারণ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে তেমন কাজ রাজদ্রোহ হিসাবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যাই হোক, এই ধরণের কাজকর্মের ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে খ্রিষ্টান হওয়ার প্রবণতা অনেক কমে গেল।

কিন্তু কলকাতায় মিশনারীরা ছেলেমেয়ে ধরার উদ্দেশ্যে লরেটো কলেজ, ডিভোতা কলেজ ইত্যাদি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলো।

আজকের 'ঘর ওয়াপসী' উনিশ শতকের বাঙ্গলার 'পতিতোদ্ধার সভা'র পতিত উদ্ধারেরই আধুনিক রূপ। বা, আর্য সমাজের শুদ্ধি আন্দোলনের রকমফের। হিন্দুর দৃষ্টিতে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে মানুষ পতিত হয়ে যায়। সেই পতিত মানুষকে উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে আনাই 'ঘর ওয়াপসী'।

সেমেটিক ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'মঠের নিয়মাবলী'তে লেখেন:

"মুসলমান বা খ্রিষ্টানদিগকেও হিন্দু ধর্মে আনিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে।' তিনি আরও লিখেছেন, "যে কেহ হিন্দুধর্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটি শত্রু অধিক হয়।"

সম্প্রতি আগ্রাতে এক দরিদ্র হিন্দু কাগজ কুড়ানী এক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। আগ্রাতে বাঙলাদেশ থেকে বেশ কিছু অনুপ্রবেশকারী মুসলমান কাগজ কুড়ানীর কাজ করে অন্নসংস্থান করে। তাদের কোনওরকম ভারতীয় পরিচয়পত্র নেই। সুতরাং তাদের প্রয়োজন ছিল ভোটার আইডেনটিটি কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদির। তারা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান হলে এগুলি তাদের থাকতো। আমাদের হিন্দু কাগজকুড়ানী তাদের রেশন কার্ড ইত্যাদি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য। একটি পরিত্যক্ত গুদাম সাফ করে তাদের ধর্মান্তরকরণের ব্যবস্থা হয়। সাংবাদিকদের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আগুন জ্বালিয়ে যাগযজ্ঞ চলছে। গোল টুপি পরা কিছু মুসলমান যজ্ঞকুণ্ডের আশপাশে বসে আছে।

কিন্তু তখন দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে এমন একজন হিন্দু বসে আছেন, যিনি রমজান মাসে মাথায় মুসলিমসুলভ গোল টুপি পরে ইফতার পার্টিতে গিয়ে ধার্মিক মুসলমানরা সারাদিন অনশনের পরে যা খায় তা দুপুরে ভরপেট খাওয়ার পর সন্ধ্যেবেলা গপ গপ করে কোনও দিন খাননি। অনুরোধেও তিনি রাজী হননি গোল টুপি পরতে। সুতরাং ভারতের পঞ্চম বাহিনীর সাংবাদিক ও গোলটুপি পরা সেকুলার রাজনীতিবিদরা, যারা অন্তরে অন্তরে অতীতের মুসলিম শাসনের প্রতি জোড়হস্ত, তারা তুমুল শোরগোল তুললেন। গরম করলেন পার্লামেন্ট। ব্যাপার দেখে সমাজবাদী পার্টির নেতা, যিনি কিনা মুসলিমদের মসীহা, তিনিও বিস্মিত হয়ে গেলেন। কারণ, ব্যাপারটা ঘটেছে আগ্রায় আর তাঁর পুত্র উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি পার্লামেন্টে বললেন, এ ব্যাপার নিয়ে পার্লামেন্টে এতো শোরগোল কেন? আগ্রার অন্য পাড়ার মানুষরা পর্যন্ত যে ব্যাপারটা জানেনা?

আগ্রার অন্য পাড়ার মানুষরা না জানুক, যেসব অসৎ রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করে চুরি চামারি করে নিজেরা কোটিপতি হয়, তাদের চোখে নরেন্দ্র মোদীর সিংহাসনে আরোহন মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। তাদের কাজ হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের গোষ্ঠীচেতনা উশকে দেওয়া। সেই জন্যেই তারা পার্লামেন্টে হৈ চৈ শুরু করলো। নষ্ট করলো পার্লামেন্টের মূল্যবান সময়।

ওদিকে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদেরই একজন, যে 'ধর্মান্তরে' সামিল হয় নি, সে থানায় অভিযোগ জানালো। পুলিশ গ্রেপ্তার করলো আমাদের কাগজ কুড়ানীওয়ালাকে। ব্যাপারটা বড় করে ছাপানো হলো সংবাদপত্রগুলিতে। যারা হিন্দু নারী যখন ধর্ষিতা হয় মুসলমান লম্পটদের হাতে, তখন এমনভাবে সংবাদ ছাপে যাতে নারীটি যে হিন্দু তা কখনও বোঝা না যায়। দক্ষিণবঙ্গে হিন্দু দোকানদারদের দোকান যখন লুঠ হয় সংঘটিত মুসলিমদের দ্বারা, তখন তারা চুপচাপ থাকে।

আমাদের কাগজকুড়ানীওয়ালার একটা বিষয়ে জ্ঞান ছিল না, অবশ্য কোন হিন্দুরই বা আছে, যে ইসলামী শাস্ত্রে 'তাকিয়া' বলে একটা কথা আছে, যার অর্থ 'পবিত্র প্রতারণা' বাঙ্গলাদেশী মুসলমানরা আসলে তাই অবলম্বন করেছিল। সমস্ত ঘটনার পরে দেখা গেল তারা যথারীতি নামাজ পড়ছে। তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য হিন্দু হওয়ার ভাণ করেছিল মাত্র। যাই হোক, ঘরের ছেলে ঘরেই আছে। হিন্দুর সংখ্যা একটিও বাড়েনি।

কিন্তু, সমসময়ে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় বিহারের ভাগলপুরের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে একটি গ্রামে কিছু দরিদ্র মানুষ বহুদিন ধরে বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। মিশনারীদের দালালরা তাদের বুঝিয়েছিল, যিশুর নাম স্মরণ করলে তাদের রোগমুক্তি ঘটবে। তারা যিশুর নাম স্মরণ করতে রাজী হয়ে গিয়েছিল। তখন কিছু পাদ্রী উপস্থিত হলো সেখানে। তারা ঐ মানুষদেরই একটি ঘরকে গীর্জায় পরিণত করে মানুষগুলিকে খ্রিষ্টান করতে লেগে গেল। গ্রামের মাতব্বররা জানালো, মিশনারীরা গ্রামের লোকদের কিছু ওষুধ বিলি করেছে। সেই ওষুদ পেয়েই দরিদ্র মানুষদের ব্যাধির কিছু উপশম হয়েছে। এবার শর্ত অনুযায়ী তারা খ্রিষ্টান হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতারণা করে বা জোর করে ধর্মান্তরের অভিযোগ কেউ করেনি।

এইভাবেই মানুষের দারিদ্রতার সুযোগে মানুষকে সামান্য সুবিধা দিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারীরা ভারতবাসীদের ধর্ম হরণ করে পৃথিবীতে খ্রিষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

এই সব ব্যাপার যখন ঘটছে তখন 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এক প্রাক্তন আই এ এস'এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। ভদ্রলোকের নাম, এম জি দেবসাহায়ম। নাম থেকে খ্রিষ্টানদের ধর্ম আজকাল বোঝা যায় না। সুতরাং এই মিশনারীদের দালালটি খুব সম্ভবত একজন খ্রিষ্টান।

তিনি আদিবাসীদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের সপক্ষে বেশ যুক্তি দিয়েছেন। ....." মিশনারীরা স্কুল ও হাসপাতালের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত করে ও অসুস্থ হলে সেবা করে। তারা শিক্ষিত হলে সরকার, ব্যবসায়ীরা তাদের আর শোষণ করতে পারে না।...."। মিশনারীরা মানুষকে শিক্ষিত করেন, রোগীর সেবা করেন, এসব খুব ভালো কথা, কিন্তু তারা সেই সঙ্গে আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করতে চান কেন? তাদের উদ্দেশ্য কি নিছক দরিদ্রসেবা? কৈ রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘও তো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানব সেবা করেন, নানা স্কুল করে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। হাসপাতাল করে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তারা তো কাউকে বলেন না, তোমাকে ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হতে হবে? মিশনারীদের সবকিছুই কি স্বার্থগন্ধযুক্ত নয়? এবার আদিবাসীদের দিক থেকে ব্যাপারটা দেখা যাক: তাদের চিরাচরিত ধর্মের বদলে তারা শিক্ষিত হবে, অর্থ উপাজ্জন করবে। অর্থাৎ অর্থ উপাজ্জন করে ধনী হওয়াই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এরজন্য চিরাচরিত ধর্মটাকে বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু মানুষ ধর্মের জন্য মরণপণ লড়াই করে, এটাই ইতিহাস। ইউরোপ আমেরিকায় খিষ্টধর্ম প্রসারিত হয়েছে তরবারী ও আগুনের দ্বারা বহু মানুষের জীবন হরণ করে। আর নিবন্ধকার মিশনারীদের হয়ে দালালী করছেন যে আদিবাসীরা শিক্ষা ও আর্থিক সচ্ছলতার জন্য তাদের চিরাচরিত ধর্মটাকে বিক্রী করে দিক। নিবন্ধকার অবশ্যই অত্যন্ত অর্থলোভী। অর্থের লোভে তিনি নিশ্চয় যাবতীয় অনৈতিক কাজ করেন। অর্থ উপার্জনের জন্য হয়তো নিজের পরিবারের নারীদেরও সব রকম অনৈতিক কাজ করতে পরামর্শ দেন।

এই মক্কেল আবার লিখেছেন, খ্রিষ্টধর্ম ভারতে নতুন নয়, ৫২ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট টমাস প্রথম ভারতে আসেন খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে।

এটা একটা বিশাল মিথ্যা কথা। খ্রিষ্টধর্ম ৫২ খ্রিষ্টাব্দে কোনও আকারই গ্রহণ করে নি। ইতিহাস বলে রাজদ্রোহের অভিযোগে একজন ইহুদীকে রোমান সম্রাটের আধিকারিক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ইহুদী 'পরিত্রাতা যিশু' হন অনেক পরে। বস্তুত রোমান সম্রাটদের হাতে পড়েই যিশু মানুষের 'পরিত্রাতা' (ক্রাইষ্ট) হন। রামমোহন রায় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। প্রায় আড়াই শো মঙ্গলবাণী বা গসপেলের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। যদিও বাইবেলে মাত্র চারটি মঙ্গলবাণী বা গসপেল পাওয়া যায়। এবং তাদের বক্তব্যের মধ্যে দেখা যায় বেশ কিছু পার্থক্যও। মোটের উপর সেন্ট টমাস একটি কাল্পনিক চরিত্র। যদিও চেন্নাইয়ের মায়লাপুরে একটি 'সেন্ট টমাসের সমাধি'। আছে আর বলা হয়, সেন্ট টমাসকে ব্রাহ্মণরা মেরে ফেলেছিল।

আসলে চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়া থেকে প্রথম ভারতে আসে কিছু খ্রিষ্টান। তাঁদের যে নেতা তাঁর নাম ছিল টমাস ক্যানা। এই টমাস ক্যানাই শেষ পর্যন্ত হয়ে যান সেন্ট টমাস।

দি স্টেটসম্যান আদতে ছিল ব্রিটিশদের সংবাদ পত্র। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মিশনারীদের কাগজও। বর্তমানে দি স্টেটসম্যান পরিচালনা করে কমিউনিষ্ট মনস্ক কিছু মানুষ। সেজন্য সংবাদপত্রটি প্রবলভাবেই হিন্দু বিরোধী। এবং অবশ্যই পূর্বকার মতো মিশনারী বান্ধব। সেই জন্যই এমন উৎকট ধরণের একটি উত্তর সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে।

এবার আসল ইতিহাসটা একটু জানা যাক। আগেই বলেছি, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমক সম্রাট কন্সটানটাইনের হাত ধরে খ্রিষ্টানী রাজানুগ্রহ লাভ করে। রোমক সাম্রাজ্যের রাজধর্ম হয়ে যায় খ্রিষ্টানী। চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়া ছিল পারস্যের জৌরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অধীন। সেখানে কিছু খ্রিষ্টানের বাস ছিল। সে সময় পারস্যের সঙ্গে বিবাদ বাঁধলো রোমক সাম্রাজ্যের। এতে খ্রিষ্টান প্রজারা সমর্থন করলো রোমক সাম্রাজ্যকে। ফলে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় শাপুর হতাশা প্রকাশ করেন বলেন যে, আমরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত; কিন্তু ওরা আনন্দে নাচছে। আমাদের দেশে বাস করেও ওরা রোমক সাম্রাজ্যের সমর্থক।

শাপুর-২ কিছু খ্রিষ্টানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বাকীদের উপর দ্বিগুণ করলেন করভার। তারপর তাদের ফিরিয়ে আনলেন পুরাতন জৌরাষ্ট্র ধর্মে।

ঐ তাড়িয়ে দেওয়া সিরিয় খ্রিষ্টানরাই জাহাজ ভাসিয়ে উপস্থিত হলো মালাবার উপকূলে। তারা জানতো সাগর পেরিয়ে একটা দেশ আছে যেখানে গেলে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায়। তাদের আগে ইহুদীরা সেখানে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে।

মালাবারের রাজা করুণার চোখেই দেখলেন আগত সিরিয় খ্রিষ্টানদের—যাদের এখনও নাসারিণ বলে স্থানীয়রা। তাদের অনুমতি দিলেন মালাবারে বাস করার জন্য। প্রতিবেশী রাজাদেরও চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন সিরিয়দের বাস করতে দিতে। মালাবারে কোটেম স্কুলে এখনও কিছু তামার ফলক দেখা যায়। যাতে লেখা আছে খ্রিষ্টান অতিথিদের প্রতি রাজার বাণী। এই সিরিয় খ্রিষ্টানদের নেতা ছিলেন একজন টমাস। টমাস ক্যানা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজ জলদস্যুরা মালাবারে উপস্থিত হয়। তখন সিরিয় খ্রিষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে অন্তত তিরিশ হাজার। ভাস্কো ডা গামা যখন দ্বিতীয়বারের জন্য এলো ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে তখন সিরিয় খ্রিষ্টানদের এক প্রতিনিধি দল ডা গামার সঙ্গে দেখা করলো। কাগজপত্র ও একটি দণ্ড দেখিয়ে প্রমাণ করলো যে তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা খ্রিষ্টান। তারপর তারা ডা গামাকে হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে বৃত হওয়ার অনুরোধ জানালো। তারা ডা গামাকে ক্র্যাঙ্গানোরে (কোদুনগ্যালুরে) একটা দুর্গ বানাবার প্রস্তাবও দিল। এইভাবে ধর্মান্ধ সিরিয়ান খ্রিষ্টানরা তাদের পূর্বতন আশ্রয়দাতাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পর্তুগালের খ্রিষ্টান রাজাদের দিকেই ঢলে পড়লো।

১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ান খ্রিষ্টান বিশপ মার জেকব ডা গামাকে লিখেছিল, দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সিরিয় অতিরিক্ত সেনা হিসাবে কাজ করবে। মার জেকব ডা গামাকে প্রস্তাব

দিয়েছিল ক্রাঙ্গানোরে একটি দুর্গ নির্মাণ করার জন্য। দশ বছর পরে পর্তুগীজ উপনিবেশ তৈরীর জন্য ক্রাঙ্গানোরে একটি দুর্গ সত্যই নির্মিত হয়েছিল। এই বিশ্বাসঘাতকতার কিছু প্রতিফল অবশ্য ভোগ করতে হয়েছিল সিরিয়দের। তারা আদিতে ছিল মেথডিস্ট চার্চের খ্রিষ্টান। পর্তুগীজরা গায়ের জোরে তাদের রোমান ক্যাথলিক হতে বাধ্য করেছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান মিশনারীদের কর্মপদ্ধতি

পরাধীন ভারতে মহাত্মা গান্ধি মিশনারীদের ধর্মান্তরকর্ম মোটেই সমর্থন করতেন না। তিনি ভাবতেন মিশনারীরা সেবাকর্ম করে নিছক সেবাকর্ম করার তাগিদেই। সেবাকর্ম যে ধর্মান্তর করার উদ্দেশেই করা, জাতির পিতা তা বুঝতেন না। তিনি বলেছিলেন, মিশনারীরা যত ইচ্ছা সেবাকর্ম করতে পারে, কিন্তু তারা ধর্মান্তর করতে পারবে না। সি এফ অ্যান্ড্রুজকে তিনি বলেছিলেন, একজন হিন্দুকে ধর্মান্তর করার আগে তাকে ভালো করে হিন্দুধর্ম শেখাবে। তারপর সে যদি হিন্দুধর্মে সন্তুষ্ট না হয়, তখন তাকে ধর্মান্তরিত করবে। বলা বাহুল্য, প্রতিটি খ্রিষ্টান মিশনারীর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম মিথ্যাধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। কোনও মিশনারীই কাউকে হিন্দুধর্ম শেখাতে যাবে না।

কিন্তু এই গান্ধিই স্বাধীনতার প্রাক্কালে স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড কেলাসের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, ভারত ধর্মেতর থাকবে, কিন্তু প্রত্যেকেই দেশের সাধারণ আইন ক্ষুন্ন না করে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবেন।

ব্রিটিশ আমলে মিশনারীদের 'ধর্ম পালন' বোঝাতে তাদের ধর্মান্তরকরণও বোঝাতো। এখনও তাই রয়ে গেল। গান্ধি ধর্মান্তরকরণের বিরোধিতা আর করলেন না।গান্ধিশিষ্য নেহরু আবার আর একটা কুকাজ করলেন। প্রথম নেহরু মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন রাজকুমারী অমৃত কাউর। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের কর্পূরতলার রাজকন্যা এবং একজন প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান। পঞ্চাশের দশকে তিনি নেহরুর কাছে আবদার করলেন, ধর্মান্তরকরণের জন্য বিদেশী মিশনারীদের ভারতে আসতে দিতে হবে। মিশনারীদের ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। সঙ্গে সঙ্গে নেহরু বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে জানিয়ে দিলেন, বিদেশী মিশনারীদের কাজেকর্মে যেন বাধা না দেওয়া হয়।

খ্রিষ্টান মিশনারীরা ভারতে বসে ধর্মান্তবকরণ করার জন্য চারটি চালাকি করে, যা সাধারণ হিন্দুরা কল্পনাও করতে পারে না। সেগুলির মধ্যে প্রথমটি হলো, সোজা ধর্মান্তর। একটি ব্যক্তিকে বা একদল মানুষকে 'মিথ্যা ধর্ম' থেকে 'সত্য ধর্মে' নিয়ে আসা হলো ধর্মান্তর। এটাই হলো খ্রিষ্টীয় সম্প্রসারণবাদের মূল স্তম্ভ। এটা করার জন্য রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথমে প্যালেস্টাইনে ও পরে রোমে খ্রিষ্টায়িত মানুষরা প্রথমে চুপে চুপে প্রতিমাপূজকদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে ক্রমাগত চিরস্থায়ী নরকের ভয় ও চিরস্থায়ী স্বর্গসুখের প্রলোভন

দেখাতো। এইভাবে দুর্বলচেতা মানুষদের মধ্য থেকে কিছু লোক খ্রিষ্টায়িত হতো। কিন্তু রোমের সম্রাটরা প্রতিমাপূজক হওয়াতে সে সময়ে খ্রিষ্টানরা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। রোমান সম্রাট নিরোর রাজত্বে রোম শহরে একবার আগুন লাগে। সম্রাট নিরো এ ব্যাপারে রোমের খ্রিষ্টানদের সন্দেহ করেন এবং তাদের সাজা দেন। পরে খ্রিষ্টানরা প্রচার করে যে রোম যখন জ্বলছিল, তখন সম্রাট নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা একটা কুৎসিত মিথ্যা কথা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লিখেছে, নিরো আগুন লাগার সময় রোম থেকে ৩৭ মাইল দূরে একটি শহরে ছিলেন।

যাইহোক, প্রতিমাপূজকরা তাদের আরাধ্য প্রতিমার গুণকীর্তন করতে গিয়ে অন্য প্রতিমাপূজকদের সঙ্গে খুচরো বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন, এটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনা। তখন তারা রাজার কাছে যেতেন বিবাদ ভঞ্জনের জন্য। শাসনকার্য্যের অনেকটা সময়ই ব্যয় হতো এইসব খুচরো ঝামেলার কারণে। রোমক সম্রাটরা খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অবহিত ছিলেন। বুদ্ধিমান কনস্টানটাইন স্থির করলেন খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বকেই নিজের সাম্রাজ্যবাদী কর্মে ব্যবহার করবেন। সেই অনুযায়ী তুরস্কের নাইসিয়াতে তিনি যাবতীয় বিশপদের একটি সম্মেলন ডাকালেন। সেখানে স্থির হলো খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্যে ঢোকানো হবে যে যিশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা। যিশুর স্মরণ না নিলে প্রতিটি মানুষই নরকে যাবে। এই বক্তব্য দ্বারা কনস্টানটাইন খ্রিষ্টধর্ম দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করতে মনস্থ করলেন। এর দ্বারা প্রতিমাপূজকদের খুচরো ঝামেলা থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে যাবেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ এক ধর্ম ও এক রাজার অধীন হয়ে থাকবে। বস্তুত, যিশুই একমাত্র পরিত্রাতা, এই প্রচারই আজ মিশনারীদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রত্যেক মানুষই আদম-ঈভের জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়া রূপ আদিম পাপের দ্বারা পাপী, সেজন্য তাঁরা নরকে যাবে। কেবলমাত্র যিশুকে পরিত্রাতা হিসাবে মানলে পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে, স্বর্গগামী হবে তারা।

আমরা যখন সবে কলেজে প্রবেশ করেছি, তখন খ্রিষ্টানদের প্রতিষ্ঠিত হস্টেলে থাকা সহপাঠীদের পাল্লায় পড়ে বাইবেল ক্লাসে যোগ দিয়েছিলাম। একটা পকেটবুক সাইজের বাইবেল (শুধুমাত্র নিউ টেস্টামেন্ট) এসেছিল আমার কাছে। ঐ বাইবেলের শেষে ছিল একটি নিদর্শ। তার শেষে প্রশ্ন ছিল, তুমি কি যিশুকে পরিত্রাতা বলে মনে করো? আমি লিখে বসেছিলাম, হ্যাঁ। তাতে অবশ্য কিছু হয় নি। কারণ, ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানকে নিয়ে কোনও মিশনারী কিছু করার সাহস দেখায় নি। কিন্তু গুজরাটের আদিবাসী অধ্যুসিত ডাংসের ব্যাপারটা অন্যরকম। সেখানে মিশনারীরা আস্তানা গেড়েছিল নিয়মিত পরিকল্পনা অনুসারেই। আদিবাসীরা হিন্দু নয়—ভূতপ্রেতের উপাসক। সুতরাং তাদের ধর্মান্তরিত করার অধিকার মিশনারীদের একশো শতাংশ আছে। কিন্তু একদা মিশনারী নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইন ভারতের

আদিবাসীদের নিয়ে ব্যাপক চর্চা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, উত্তরপূর্ব ভারত ছাড়া বাকী ভারতের আদিবাসীদের বুঝতে গেলে হিন্দুধর্ম জানতে হয়। আর উত্তরপূর্বের আদিবাসীদের ধর্ম বোঝার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম জানা অত্যবশ্যক। সহজ অর্থ, আদিবাসীদের ধর্ম হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে দূরবর্তী নয়; ভূতপ্রেতের উপাসক নয় তারা কেউই। ডাংসের আদিবাসীদের খ্রিস্টায়িত করার জন্য মিশনারীরা যেমন খড়ের চালার কিছু গীর্জা বানিয়েছিল, আলেকজান্ডার ডাফের আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য কিছু বিদ্যালয়ও বানিয়েছিল তারা। অক্ষরজ্ঞানহীন আদিবাসীদের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয়েছিল সেইসব বিদ্যালয়ে। তাদেরও গুজরাটি ভাষায় লেখা পকেট বুক সাইজের বাইবেল দেওয়া হয়েছিল; সেই বাইবেলের শেষে সেই চিরন্তন প্রশ্ন, তুমি কি যিশুকে পরিত্রাতা বলে গণ্য কর? আদিবাসী সন্তানদের কেউ না কেউ লিখেছিল, হ্যাঁ। ব্যস। তাদের খ্রিস্টায়িত করা হচ্ছিল তারা খ্রিষ্টধর্মে অনুরাগী এই অজুহাতে।

ব্যাপারটা দেখে কিছু হিন্দু নেতা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম বাহিনীর খবরের কাগজগুলি তাদের তুলো ধোনা শুরু করতে শুরু করলো। উপকারী মিশনারীরা আদিবাসীদের শিক্ষিত করার কাজ করে যাচ্ছিল। তাদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

মিশনারীরা দু-একটি খড়ের চালের গির্জাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জানালো, চ্যাপেলে আগুন লাগানো হচ্ছে। 'চ্যাপেল' শব্দটি পড়েই কাছাখোলা কালিদাস পাঠক ধরে নিল গুজরাটে হিন্দুরা সাংঘাতিক কর্ম করছে। মিশনারী-মনস্ক পঞ্চম বাহিনীর পত্রিকাগুলি এটাই চাইছিল। তারা সমবেতভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে গালির জেহাদ চালিয়ে গেল। এই সময় উত্তর ভারত থেকে এক শিক্ষিতা বাঙ্গালী মহিলা জানালেন, তিনিও মিশনারী স্কুলে পড়েছিলেন। তাঁকে ঐ রকম নিদর্শ দেওয়া হয়েছিল পূরণ করার জন্য। কিন্তু তিনি যিশুকে পরিত্রাতা হিসাবে গণ্য করেন নি।

তিনি অবশ্যই এক শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। মিশনারীরা এমন পরিবারের সন্তানদের মোটেই ঘাঁটায় না। কিন্তু প্রথম পুরুষে বিদ্যালয়ে পড়তে আসা বালক বালিকাদের ক্ষেত্রে কি এমন কথা খাটে?

দেশে অজন্মা, খরা বন্যা হলে সমাজ সীমান্তের দরিদ্র আদিবাসী ও তপশীলিভুক্ত উপজাতিরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিশনারীরা এমন পরিস্থিতির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে। অকালের সময় টাকা পয়সা দিয়ে তারা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করে; পরিবর্তে তারা ধর্মান্তরিত করে দুর্দশাগ্রস্তদের। এই 'রাইস খ্রিষ্টান'দের কথা আগেই বলেছি।

দেশে খরা-বন্যা ইথ্যাদির জন্য খ্রিষ্টীয় মৌলবাদীরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। সুনামীর সময় দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী জেলেরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঐ সময় সেখানে উপস্থিত হয় মৌলবাদী মিশনারীরা। তারা সুনামীগ্রস্থদের ঘর বানিয়ে দেয় নতুন করে। পরিবর্তে তাদের

গ্রহণ করতে হয় খ্রিষ্টানী। নেপালের বিগত ভূমিকম্পের সময় ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন নিঃস্বার্থ সেবাকাজ চালালেও গাদা গাদা বাইবেল উপস্থিত হয় বিভিন্ন দেশের খ্রিষ্টান মৌলবাদীদের কাছ থেকে । যেন বাইবেল একটা খাবার জিনিস।

ফিরে আসি কনস্টানটাইনের কথায়। কনস্টানটাইন সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে খ্রিষ্ট ধর্মের কিছু সংস্কার করলেন; ফলে বিশপরা ও খ্রিস্টানরা সাধারণভাবে উৎসাহিত হয়ে প্রতিমাপূজকদের ও উপর জোর জবরদস্তি খাটাতে শুরু করলো ধর্মান্তরকরণের জন্য। প্রশাসন ব্যাপারটা মেনেও নিল। এইভাবে সারা ইউরোপ জুড়ে প্রতিমাপূজকদের বেশ দুর্দিন শুরু হলো। প্রতিমাপূজকরা শহর ছেড়ে আশ্রয় নিল গ্রামে, জঙ্গলে। গ্রামে যারা বাস করে তাদের বলতো পেগানাস। সেই থেকে প্রতিমাপূজকদের নাম হলো পেগান। কিন্তু তাতেও তারা রেহাই পেল না। তাদের ধরে ধরে খ্রিষ্টান করা হতে লাগলো। না হলে, তরবারি ও আগুন। খ্রিষ্টান হয়েও রেহাই নেই। তারা নিয়মিত খ্রিষ্টধর্ম পালন করছে কিনা, আড়ালে প্রতিমাপূজা করে কিনা, তা নজর রাখা হতো। কিন্তু এতৎ সত্বেও প্রতিমাপূজার অবসান হয় নি। তাছাড়া পারস্যের মনি নামক এক ধর্মপ্রচারকের অনুগামী বহু মানুষ তখন ইউরোপে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনীতির ধর্মেতরায়নের আগে মূল ইউরোপের ব্যাপকতম যুদ্ধগুলি প্রতিমাপূজক বা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেই হয়েছে। বাল্টীক প্রতিমাপূজকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রতিমাপূজকরা ইউরোপ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১২০৯-১২১২ অব্দে মনিকীয় কাথারদের বিরুদ্ধে টিউটনিক নাইটদের ধর্মযুদ্ধ নিছক গণহত্যা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাপ ক গণহত্যা করা হয়েছিল খোদ ইউরোপেই।

ইউরোপে প্রতিমা পূজার অবসানের পর ক্যাথলিক প্রধান পোপের নজর গেল বাইরের দিকে। ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে জুন পোপ আলেকজান্ডার এক সনদবলে গোটা পৃথিবীকে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে ভাগ করে দেন। পর্তুগালের ভাগে পড়ে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্য। স্পেনের ভাগে পড়েপশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমেত গোটা আমেরিকা।

সেই অনুযায়ী স্পেনের রাজা একের পর এক জাহাজ ভর্তি সৈন্য ও মিশনারী পাঠান নব আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের দিকে। এইসব মিশনারী সাধুদের বর্বর কীর্তিকলাপ জ্বল জ্বল করছে ইতিহাসের পাতায়।

দুই আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে তখন রেড ইন্ডিয়ান ও অ্যাজটেক, মায়া, ইনকা সভ্যতাজাত বহু আদিবাসীর বাস। বোম্বেটেদের দল আমেরিকার স্থলভাগে পৌঁছে উপস্থিত হলো আদিবাসীদের কাছে। পকেট থেকে বার করলো পার্চমেন্ট কাগজে লেখা 'রিকোয়ারমেন্টো'। রিকোয়ারমেন্টো হলো বশ্যতা স্বীকারের নির্দেশ। নির্দেশ স্বয়ং মহামান্য পোপের। যিনি কিনা গোটা পৃথিবীর জল-স্থলের অধিকর্তা। অধিবাসীরা না জানে স্পেনীয়

ভাষা, না জানে পোপ, ক্যাথলিক চার্চ বা স্পেনের রাজাকে। তাতে কী। মৌলবাদী খ্রিষ্টানরা গড় গড় করে পড়ে যেত, এতদ্বারা তোমাদের সর্বশক্তিমান পোপ ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর বশ্যতা স্বীকার করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় তোমাদের জান, মান ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

উভয় আমেরিকার শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা স্পেনীয় ভাষা না বুঝলেও স্পেনীয়দের তরবারীর ভাষা বুঝতো। কাজে কাজেই তারা সুড় সুড় করে এগিয়ে যেত মিশনারীদের দিকে। খ্রিষ্টান উপনিবেশ নির্মাণের জন্য বেগার শ্রমিক হিসাবে খাটানো হতো তাদের। অনাহার আর অত্যাচারে তাদের অধিকাংশেরই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো অচিরেই। তারা পুরস্কৃত হতো খ্রিষ্টীয় কবরের দ্বারা। মোক্ষ লাভ করতো তাদের আত্মা।

তারপর থেকে মিশনারীরা জোব্বার পকেট থেকে পার্চমেন্ট পেপার বের করলেই আদিবাসীরা ছুট দিত গ্রাম থেকে। তাতে তাদের জান বাঁচলেও মান-সম্পত্তি বাঁচতো না। কী হতো আমেরিকার আদিবাসীদের? স্ত্রীলোকেরা তো পাপে ভরা। তাদের নিশ্চয় বোম্বেটে বা মিশনারীরা বিয়ে করতে পারেনা! তবে তাদের উপপত্নী করে রাখতে বাধা নেই। সুতরাং তারা স্থান পেত মিশনারীদের হারেমে। আর শিশুগুলি তো কচি কাঁচা। তাদের বাপ-মা পাপী হলেও তাদের মধ্যে পাপ ঢোকেনি ততোটা -- সেই আদম-ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার আদিম পাপ ছাড়া। কাজে কাজেই তাদের আলাদা করে অনাথ আশ্রমে মানুষ করা হতো পৃথিবীতে খ্রিষ্টানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। যাতে যিশুর পুনরার্বিভাবের দিনে গোটা পৃথিবীটা খ্রিষ্টানে খ্রিষ্টানে টইটুম্বুর করে দেওয়া যায়। এইভাবে সমগ্র আমেরিকার আদি অধিবাসীদের নিহত ও শৃঙ্খলিত করে খ্রিষ্টানীর শান্তির বাণী প্রচার করে স্পেনীয় বোম্বেটেরা।

স্পেনীয়রা যখন পোপের নির্দেশে জাহাজ ভাসিয়েছিল আমেরিকার দিকে, তখন একইভাবে পর্তুগীজেরা হার্মাদ পাঠিয়েছিল এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। কিন্তু তাদের তরবারী ও পোপবাণী তেমন সফল হয়নি। কারণ, স্থলের যুদ্ধবিদ্যায় এশিয়ার অধিবাসীরা তেমন অদক্ষ ছিল না। তাছাড়া বুদ্ধ-কনফুসিয়াসের ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের তুলনায় খ্রিষ্টানীর বাণী নিতান্তই অসার। কিন্তু জলদস্যুতায় পারঙ্গম হওয়ার জন্য উপকূলের কিছু অঞ্চলে পর্তুগীজরা সামান্য সুবিধা করতে পেরেছিল।

ভারতে খ্রিষ্টান মিশনারীরা

সেই মুঘল আমল থেকে ক্যাথলিক মিশনারীরা ভারতে খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখলেও ইংরেজরা প্রাথমিকভাবে বাণিজ্য করতেই এদেশে এসেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত হলেও নিরাপদে সাম্রাজ্য ভোগ ও বাণিজ্য করার মানসে এদেশের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতিতে কোনও রকম হস্তক্ষেপের

বিরোধী ছিল উত্তর সাগরের দ্বীপপুঞ্জবাসীরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক পরিচালক নাকি বলেছিলেন, একদল মিশনারীর থেকে বরং একদল শয়তানকে বরদাস্ত করবো।

কিন্তু কোম্পানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সরকারী মদতে কীভাবে ভারতে খ্রিষ্টানী বিতরণ শুরু করলেন তা আগেই বর্ণনা করেছি। তার ফলটা কেমন বর্ণাঢ্য হয়েছিল তা রামমোহনের বর্ণনা থেকেই জানা যাক :

১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র ভূমিকাতে রামমোহন লিখেছেন, "ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি যাহারা মিসনরী নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুৎ করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতা ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপন ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন। তৃতীয় প্রকার এই যে কোনও নীচ লোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনও কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।"

রামমোহন হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথা নিয়ে সরব হলেও নিজের হিন্দুসত্তা মুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেননি। কলকাতার লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচয়কালে তিনি খ্রিষ্টানী গ্রহণ করেছেন ধরে নিয়ে উন্নততর ধর্মগ্রহণের জন্য বিশপ মিডলটন তাঁকে অভিনন্দন জানালে তিনি সবিনয়ে তাঁর ভুল সংশোধন করে দিয়ে বললেন, এক কুসংস্কারের বদলে অন্য কুসংস্কার বরণ করার জন্য তিনি কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করেননি।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয়দের নানাছলে খ্রিষ্টায়িত করার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সরব হন একদা ইংরেজ মিশনারী প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ের এলুইন। তিনি একজন মিশনারী রূপেই ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আদতে ছিলেন একজন মানবতাবাদী। ব্রিটীশ আমলে ইউনিয়ন জ্যাক ছিল খ্রিষ্টানীরই পতাকা, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই বক্তব্যে গাঁধীশিষ্য এলুইনকে কংগ্রেস করতে বাধা দিয়েছিলেন মধ্য প্রদেশের অ্যাংলিক্যান বিশপ। এইসময় 'দীনবন্ধু' অ্যান্ড্রুজ সমেত অন্যান্য মৌলবাদী মিশনারীরা পরিকল্পনা করেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আপাততঃ রেহাই দিয়ে আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের খ্রিষ্টানীর ছত্রতলে নিয়ে আসতে হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মিশনারীরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে, নেশাগ্রস্ত করে ও ঐহিক সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে আদিবাসী ও নিম্নবর্গের ভারতীয়দের খ্রিষ্টান করতে সচেষ্ট হয়। এলুইন ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে উপজাতিদের খ্রিষ্টায়িতকরণ সম্পর্কে সতর্কীকরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এখন যে গতিতে খ্রিষ্টায়িতকরণ চলছে তাতে অচিরেই সমস্ত আদিবাসীরা ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে। এর ফলে এরা পরিবর্তিত হবে একটি

বিবদমান, জাতীয়তাবিরোধী, আক্রমণশীল সংখ্যালঘুতে। যাদের মধ্যে আদিবাসীদের সুসংস্কার কিছু থাকবে না, কিন্তু থাকবে কিছু নতুন সংস্কার, যা ভবিষ্যতের ভারত সরকারের পক্ষে কাঁটা হয়ে উঠবে।

অর্থাৎ, একজন আদিবাসী খ্রিষ্টান হলে শুধু যে তার ধর্মের পরিবর্তন হয় তাই নয়, জাতীয়তারও পরিবর্তন হয়।

দুঃখের বিষয় স্বাধীন ভারতে মহাত্মা ভেরিয়ের এলুইনের সতর্কবার্তা কেউ মনে রাখেনি। মনে রাখেননি তাঁর গুরু মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীও। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে বিদেশী ধর্মব্যবসায়ীদেরও অবাধ গতি। বুদ্ধিজীবীরা এখন মিশনারীদের উগ্র সমর্থক। বিশেষ করে মিশনারী যদি সাহেব হন। বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিক মতি নন্দী কেওনঝড়ে দারা সিংদের দ্বারা নিহত অস্ট্রেলীয় মিশনারী গ্রাহাম স্টেইনস প্রসঙ্গে লিখেছেন, "রোমান ক্যাথলিক এই মিশনারী এসেছিলেন নিরক্ষর হতদরিদ্র রোগজীর্ণ আদিবাসী উপজাতিদের সেবা করার জন্য। তিনি চেয়েছিলেন এইসব হতভাগ্য দলিত নরনারীকে, যারা প্রশাসনের দ্বারা উপেক্ষিত, উচ্চবর্ণের দ্বারা ঘৃণিত, দেশের গহন অঞ্চলে পশুর মত জীবনযাপন করা প্রান্তীয় মানুষদের তিনি এমন একটি সমাজের সদস্য করে তুলবেন, যে সমাজের ভিত্তিমূল হবে ন্যায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ।"[৪]

মতি নন্দী ফরাসী বিপ্লবের বাণীর সঙ্গে বাইবেলকে গুলিয়ে ফেলেছেন। খ্রিষ্টীয় জগতে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝ পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথা বর্তমান ছিল। তাঁর জানা নেই, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করে অস্ট্রেলিয়া অধিকার করেছিল গ্রাহামের পূর্বপুরুষ খ্রিষ্টানরা। এখনও অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে বাস করে দশ লক্ষ আদিবাসী, যারা ভারতের আদিবাসীদের থেকে বেশী ধনী বা কম উপেক্ষিত নয়। কিন্তু গ্রাহামরা তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারণ, তারা ইতিমধ্যেই খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। আর ভারতে দলিতরা খ্রিষ্টান হলেও তাদের দলিতত্ব অম্লান থাকে। সেই জন্যই দলিত খ্রিষ্টানরা নানা রকম সংরক্ষণের দাবী তুলছে। মিশনারীরা কদাচ তাদের স্বর্গে তোলে না। আর মিশনারীরা কখনও নিছক সেবার মনোভাব নিয়ে কোনও দেশে সেবা করতে আসে না। স্যালভেশন আর্মি নামক মিশনারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সেনাপতি উইলিয়াম বুথ বলেছিলেন, সেবা হচ্ছে টোপ কিন্তু পরিত্রাণ হচ্ছে বড়শী যা দিয়ে মানুষ ধরা যায়।

সুতরাং মানুষ ধরাই হচ্ছে গ্রাহাম স্টোনস্‌দের অন্তিম উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বাহিনীর প্রচার মাধ্যমগুলি আদালতের রায় বেরুনোর আগেই দারা সিংকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিয়েছে। অথচ মামলার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, স্টেইনসদের হত্যার পরিকল্পনা ছিল না দারা সিংদের। তাদের পরিকল্পনা ছিল গাড়ী জ্বালানোর। গাড়ীর মধ্যে যে স্টেইনসরা ছিল, এটা আগুন লাগানোর পরে জানতে পারে তারা।

এখন হাইকোর্ট এই মৃত্যুদণ্ড রদ করে কঠিন মন্তব্য করেছে বিচারকের সম্বন্ধে। কারণ, গ্রাহাম স্টেনসের হত্যাকাণ্ড কোনও নিরিখেই 'রেয়ারেষ্ট অফ দি রেয়ার' ছিল না। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে দ্বিতীয় ইউ.ইফ এর আমলে কারও অঙ্গুলি নির্দেশে সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল দারা সিংএর মৃত্যুদণ্ডের জন্য। কারণ, কংগ্রেস সভাপতি একজন খ্রিষ্টান। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের জজদ্বয় অত্যন্ত কঠিন মন্তব্য করেন। জজ সদাশিবম ও জজ চৌহান মন্তব্য করেন, আমাদের ধর্মেতরবাদের ধারণা হচ্ছে রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম থাকবে না। রাষ্ট্র সমস্ত ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সমদৃষ্টিতে সম শ্রদ্ধায় দেখবে এবং কোনওরকমভাবেই মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস এবং আরাধনাতে হস্তক্ষেপ করবে না। বিচারকেরা আরও বললেন, এটা অবিংসংবাদিত সত্য যে গায়ের জোরে, লোভের দ্বারা, তাদের ধর্ম অন্য ধর্মের চেয়ে উন্নত এই মিথ্যা ভিত্তিতে কারও ব্যক্তিগত বিশ্বাসে নাক গলানোর অধিকার কারও নেই।

ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়লো। প্রতিটি পত্রিকা দারা সিং এর রক্ত চাইছিল। কারণ, সে একজন সাদা চামড়ার মিশনারীকে দুটি শিশুপুত্রসহ হত্যা করেছে। তাকে তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়াও হলো না, উল্টে মিশনারীদের ধর্মান্তরের তত্ত্বটাকেই প্রশ্নে মুখে ফেলে দেওয়া হলো।

হৈ হৈ করে উঠলো খ্রিষ্টান মৌলবাদীদের সমর্থকরা। যারা কুঁড়ো খায়। চীৎকার করে উঠলো দেশী বিদেশী খিষ্টান মৌলবাদীরা। সুতরাং নিপাট সত্যকথাগুলিকে সরিয়ে দিলেন দুই জজ। খুশি হলো পঞ্চমবাহিনীরা।

ধর্মান্তরকরণ সম্পর্কে বিচারপতি এ এন রায়ের বক্তব্য

ভারতের সংবিধানের ২৫ (১) ধারাতে আছে, "Subject to public order, morality and health and to other provisions of this part, all persons are equally entiled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion"

সুতরাং এখন পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা বলবে ঐ তো propagate করার কথা আছে।

কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্সনারীর মতে, propagate কথাটির অর্থ, 'Breed by natural process from the parent stock>cause to increase number or amount, **2.** promote (an idea, knowledge etc) widely. **3.** transmit or be transmitted in a particular direction"

সুতরাং propagate কখনই কনভারসন নয়।

আজকের ভারতে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে, গ্রামীণ ভারতে ,শহর এলাকার বস্তি অঞ্চলে মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ চলছে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে। এই কাজে ব্যস্ত বিদেশী মিশনারীদের সঙ্গে এদেশী মিশনারীরাও। ধর্মান্তরিতরা দুটি ধরণের : প্রকাশ্য ধর্মান্তরিত এবং গুপ্ত ধর্মান্তরিত।

যারা তপশীলিভুত জাতির খ্রিষ্টান, তারাই নিজেদের ধর্মান্তর গোপন করে। কারণ, ধর্মান্তরিত হলে তাদের সরকারী সুবিধা—যা তারা পায় তপশীলিভুক্ত জাতি হিসাবে, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। কিছু কিছু জায়গায়, যেমন অরুণাচল প্রদেশের মতো জায়গায় ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে জনমত তীব্র, সেখান আদিবাসী খ্রিষ্টানরা নিজেদের ধর্মান্তর গোপন রাখে। কিছু কিছু মানুষ যারা সাধারণভাবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা নিজেদের ধর্মান্তর গোপন রাখে। কারণ, ধর্মান্তর প্রকাশ্যে এলে তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে পারে। আজকের ভারতে মিশনারীদের ধর্মান্তর দ্রুতগতিতে চলছে, কারণ, কাছাখোলা কালিদাস হিন্দুরা নির্বোধের মতো মিশনারীদের স্তাবকতা করছে। কিছু হিন্দু আবার টাকা পয়সা নিয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা আদিবাসীদের ধরে ধরে মিশনারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

মিলিটারী কৌশল

বিশাল ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে মিশনারীরা ধর্মান্তরের কাজ করছে। যে যার মতো এই কাজ করছে, এমন ব্যাপার নয়। একটা সার্বিক পরিকল্পনা নিয়ে এই কাজ করা হয়। এই কাজ কীভাবে হবে, কে কে করবে, কোন জায়গায় কোন চার্চ কাজ করবে, কত টাকা খরচ করা হবে—ইত্যাদি পরিকল্পনা ছকে নিয়ে ধর্মান্তরের কাজ হয়। এমনিতে বিভিন্ন চার্চের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আছে। ব্যাপারটা যখন ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণ, তখন সবাই আর্ন্তজাতিক পরিকল্পনা অনুসারে চলে। এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা কোনও গুপ্ত ব্যাপার নয়। এগুলি লিখিত প্রকাশিত দলিল এবং সবার পাঠযোগ্য।

ধর্মান্তরকরণের সৈন্যরা তিন ধরণের সাহায্যকারী গোষ্ঠীর দ্বারা পোষিত হয়ঙ্গ এই গোষ্ঠীরা ধর্মান্তরকরণের সৈন্যদের পথ সুগম করে। এই তিনটি গোষ্ঠী হলো, (ক) নিজ নিজ মাতৃভুমিতে (পড়ুন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ) তাদের সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যাতে সরকার ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে মিশনারীদের অবাধে কাজ করতে দেওয়ার জন্য। (খ) কার্যকরী খোঁচড় বা ট্রয়ের ঘোড়া—হিন্দুদেরই একাংশ যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধেঙ্গ এরা হলো প্রচার মাধ্যমের ভিতরকার মানুষ, বুদ্ধিজীবীরা, শিক্ষাজীবীরা, বিচারকদের একাংশ, প্রশাসনের একাংশ, রাজনৈতিক দল, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ—বিশেষ করে আমরা যাদের বলি এন জি ও। মাত্র কিছুদিন আগে বীরভুমের একটি গ্রামে কিছু সাঁওতাল খ্রিষ্টানকে যখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ধর্মান্তরিত করেছিল, তখন হৈ হৈ করে উঠেছিল সরকার থেকে সমস্ত সংবাদ-মাধ্যম। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীনভাই টোগাড়িয়াকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতেই নিষেধ করে তৃণমূল সরকার। কমিউনিষ্টরাও সমালোচনা করে ঘর ওয়াপসীর। অন্যদিকে ওড়িষ্যায় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যাকাণ্ডে মিশনারীরা সুপারী দেয় মাওবাদীদের। বিচারে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে

মাওবাদীরাও দণ্ডিত হয় লক্ষ্মনানন্দের হত্যার জন্য। ভারতে খ্রিষ্টীয় প্রসারণবাদের সঙ্গে মুসলিম ও কমিউনিষ্টদের, সেকুলারদের, এবং জাতিভিত্তিক রাজনীতিবিদদের একটা কৌশলী আঁতাত রয়েছে। ডাঃ বিনায়ক সেন ছিলেন ইভানজেলিকাল মিশন হসপিটালের একজন চিকিৎসক। সঙ্গে সঙ্গে মাওবাদীদের সঙ্গে তাঁর একটা সখ্যতাও ছিল। ছত্রিশগড় পুলিশ তা প্রমাণ করেছিল। তাঁকে গ্রেফতার করা হলে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নোবেল লরিয়েটরাও প্রতিবাদ জানালো। কারণ, নোবেল পুরস্কার পেলেও তারা ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান। দেশদ্রোহীতার অভিযোগে কারাদণ্ড হলো বিনায়ক সেনের। হাইকোর্ট সেই কারাদণ্ড বহাল রাখলো। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক সনিয়া গান্ধী তাঁকে পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে নিয়োগ করলেন। ওড়িষ্যার কান্ধামালে আমরা দেখেছি, মাওবাদী-মিশনারী আঁতাত হয়েছিল লক্ষ্মণানন্দ হত্যার সময়। সেই একই আঁতাত দেখা গেল বিনায়ক সেনের বেলায়।

(গ) গুপ্তভাবে আধা খ্রিষ্টান তৈরী।

খ্রিষ্টীয় সম্প্রসারণবাদীদের তৃতীয় কৌশল হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গুপ্তভাবে আধা খ্রিষ্টান তৈরী। ধনী এবং আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর মানুষরা তাদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলে পড়াবার জন্য মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলে ভর্তি করে। এইসব ছেলেমেয়েদের খ্রিষ্টান করার জন্য মিশনারীরা তেমন জোরাজুরি করে না। এইসব মিশনারী স্কুলগুলির মধ্যে বেশীভাগই রোমান ক্যাথলিক, কিছু প্রটেষ্টান্ট। এখন মিশনারীদের পরিচালিত কিছু কিছু বিদ্যালয় দেশীয় ভাষার মাধ্যমেও স্কুল চালায়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের উচ্চপদগুলি দখল করে। এইসব প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা হিন্দুই থাকে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, তারা খ্রিষ্টধর্মের কিছু কিছু বিশ্বাস, নীতি ও বিশ্বাস আত্মীকরণ করে বসে আছে। তারা জীবনের বহু ঘটনাবলীকে শুধু পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে না, একজন খ্রিষ্টানের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে। খুব ছোট থেকেই তারা 'শিশুদের গল্পের বই' এর মাধ্যমে খ্রিষ্টান মনস্ক হতে শুরু করে। তাদের বলা হয় বিপদে পড়লে গীর্জায় যাবে বা যিশুর কাছে প্রার্থনা জানাবে। গীর্জায় গেলে সন্ন্যাসিনী বা ফাদাররা তাদের সমস্যার সমাধান করেন। খ্রিষ্টান ছাত্রদের যোগদান করতে হয় বাইবেল ক্লাসে; আর অখ্রিষ্টানদের যোগদান করতে হয় 'মরাল' ক্লাশে। তাদের পাঠ্য পুস্তকে থাকে নাস্তিক, বহুদেবতাবাদী ও প্রকৃতিবাদীদের তুলনায় একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রতিমাপূজার ভ্রান্তি। যিশুর ঐতিহাসিক জীবনী নিয়ে গল্প। বা, অতিথি মিশনারীদের বক্তৃতা। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমবেত সঙ্গীতে যোগদান— যে সঙ্গীত খ্রিষ্টীয়।

এইভাবে খ্রিষ্টান না হয়েও একদল মানুষ খ্রিস্টান মিশনারীদের অনুরাগী হয়ে ওঠে। এই অনুরাগীরাই যখন মিশনারীরা হিন্দুদের ধর্মান্তর করবে তখন বাধা দেবে না। তাদের মনে হবে, খ্রিষ্টানী খারাপ কি!

সাধারণের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি

আমরা নিজেরাই দুটি সেমেটিক ধর্ম ইসলাম ও খ্রিষ্টানী সম্বন্ধে বিস্তর ভালো ধারণা সৃষ্টি করে বসে আছি। আমাদের গল্প বলা ঠাকুর বলে গেছেন, যত মত তত পথ। পথটা কীসের ? না, মোক্ষ লাভের। এমনতর কথা কে বলতে পারে ? যে বাইবেল ও কুর-আন হাদিশ পাঠ করেছেন। আমাদের গল্প বলা ঠাকুর অবশ্যই বাইবেল, কুর-আন ও হাদিশ পাঠ করেন নি। সুতরাং তাঁর কথা মানা উচিত নয়। কিন্তু গুরুবাদী ভারত বলবে গুরুর কথা বিশ্বাস করতে হয়। গুরুর গেরুয়া পরা শিষ্যরা কেউ অশিক্ষিত নয়। তাদের মধ্যে যারা উপর তলার বাসিন্দা তারাও গুরুর মিথ্যাটা বড় গলায় প্রচার করে। প্রচার না করলে তো তাদের দুধ-ভাত জুটবে না। দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কে 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ঐ প্রতিষ্ঠান 'জগতের ধর্মমত' নামে একটি বই প্রকাশ করেছে। বইয়ের প্রথমে প্রকাশক লিখেছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ) বলেছেন, 'অনন্ত মত অনন্ত পথ। সকল ধর্মের মূলসত্য সেই এক ঈশ্বর.....ঈশ্বর ভিন্ন নন।' ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্মের নাম। মুসলমানদের বিধাতার নাম 'আল্লাহ্'। আল্লাহ্র বাণীর সংকলন কুর-আন। আমাদের সগুণ ব্রহ্মের বাণীর সংকলন কি কুর-আন ? সুতরাং আমাদের গল্প বলা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বা ইসলামের কিছুই জানতেন না। তা ছাড়া আর একটি তত্ত্ব আছে। ধর্ম দু-ধরণের হয়: প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম। প্রবৃত্তি ধর্মের মানুষরা মৃত্যুর পর স্বর্গে বা নরকে যায়। কিন্তু নিবৃত্তি ধর্মের মানুষরা মৃত্যুর পর মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করতেও পারে। খ্রিষ্টানী ও ইসলামে মানুষ স্বর্গে বা নরকে যাবে কৃতকর্ম অনুযায়ী। মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করা বা, জিন বা জিতেন্দ্রিয় হওয়া ঐ সব সেমীয় ধর্মে নেই। সেই বিচারে আমাদের গল্প বলা ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' অত্যন্ত বিপজ্জনক। পাগলামি বললে অত্যুক্তি হবে না।

গল্প বলা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের কিছুই না জানলেও তাঁর বাণী 'যত মত তত পথ' স্বাধীন ভারতের কাছা খোলা সেকুলারবাদীদের জপমন্ত্র। তাদের কাছে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান সব সমান। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের বর্মা সরকার দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। বর্মিরা ভারতীয়দের মতো নির্বোধ নয়। তারা জানে মুসলমানরা মিল্লত নামে একটি বিশ্বজোড়া জাতি। তারা মনে করে গোটা বিশ্বই মুসলমানদের দেশ। সুতরাং যে কোনও দেশেই তারা বাস করতে পারে। পরে সুযোগমত সেই দেশটা তাদের দখল করতে হবে বাকী বাসিন্দাদের উৎখাত করে। 'তরানা-এ-মিল্লী' (জাতীয় সঙ্গীত) কবিতাতে ইসলামী কবি ইকবাল লিখেছেন: 'চীন ও আরব আমাদের আর মোদের হিন্দুস্তান/সারাদুনিয়াই মোদের স্বদেশ, আমরা মুসলমান''

সহি মুসলিমের ৪৩৬৩ নং হাদিশে আছে মুহাম্মদ মদিনার ইহুদীদের বলছেন, তোমাদের জানা উচিত, সারা দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল।

এই আল্লাহ্ ঈশ্বরও নয়, ভগবানও নয়। কুর-আন তাঁর বাণীর সংকলন।

সুতরাং মুসলমান না হয়ে কেউ দুনিয়ায় বাস করার উপযুক্ত নয়। তাদের উৎখাত করে ইসলাম বিশ্বজোড়া আল্লাহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। বর্মাবাসীরা ভারতীয় সেকুলারদের মতো গর্দভ নয়। তারা তাদের দেশে নিজস্ব ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। বাজারী সেকুলাররা বর্মী নেত্রী সু কি 'র কাছে হাস্যকরভাবে আবেদন করেছে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বর্মায় স্থান দেবার জন্য।

যা বলছিলাম, নিজেকে অভিজাত বলে প্রমাণ করার জন্য বহু শিক্ষিত মানুষ চাকরী থেকে অবসর নেবার পরেই সোজা রামকৃষ্ণ মিশনে ঢুকে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে সে সেকুলার হয়ে যায়। এই সেকুলাররাই অজ্ঞাতসারে খ্রিষ্টান মিশনারী ও মুসলমানদের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানরা যে একদা দেশটাকে ভাগ করে পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছে— এই জ্বলন্ত সত্য তারা ভুলে যায়। তারা নির্বোধের মতো বলে—দেশ ভাগ করেছে ব্রিটিশরা। ফলে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের দেশ দখল সুবিধাজনক হয়ে যায়। নির্বোধ হিন্দুরা অন্য ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। শিক্ষিত লোকদের কুর-আন পড়তে বললে বলে, নিজের ধর্মই জানলাম না, তায় মুসলমানদের ধর্ম। এর ফলে মুসলমানদের বলা সহজ হয়ে যায়, তাদের ধর্মে কোনও জবরদস্তি নেই। ইসলাম মানে শান্তি। হিন্দুদের আবার সুফি, পীর ফকিরদের উপর প্রবল ভক্তি। তারা পীরের দরগায় মানত করে। আজমীর গেলে পীরের দরগায় চাদর চড়ায়। ইসলামী আমলে এইসব পীর-সুফিরাই সম্রাটের গুপ্তচরের কাজ করতো। কেউ কোথাও বিদ্রোহের ছক কষলে গ্রামের সুফি বা পীররাই মুসলিম সম্রাটের কানে তা পৌঁছে দিত। মাদার টেরিজা মারা গেলে হিন্দুরা ব্যাপক সংখ্যায় ভিড় করেছিল মাদার হাউসে। মাদারের মূল কাজ ছিল প্রতিবছর গ্রীষ্ম ও বর্ষায় আমেরিকা বা ইউরোপের ঠাণ্ডায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কলকাতার ব্যাপক দুর্নাম করে মিশনারী অফ চ্যারিটির জন্য ব্যাপক দান সংগ্রহ করা। সেই টাকা দিয়ে সন্ন্যাসিনীদের জন্য আবাস তৈরী করা। বাকী টাকা রোমান ক্যাথলিকদের রাজধানী ভ্যাটিক্যানে জমা করা। মাদার টেরিজার মিশনারী অব চ্যারিটিজ কে কোনও বছরেই বন্যার কাজ করতে দেখা যায় নি। মাদার টেরিজা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে। আজ ভারতের জনসংখ্যা একশো সাতাশ কোটির বেশী। বহু নির্বোধ হিন্দু অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন মাদার টেরিজার মিশন্যারিজ অফ চ্যারিটিতে। সেই সব আম্বুলেন্স সন্ন্যাসিনী বহনের কাজেই লাগে। রাস্তা থেকে দুঃস্থ অসুস্থ তুলে আনার কাজ মাদার টেরিজার সংস্থা কোনও দিনই করে না। তুলে এনে দিলে তবেই তাকে সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীন জেনে সংস্থার 'নির্মল হৃদয়' আশ্রমে স্থান দেওয়া হয়। আপনি যতো হতদরিদ্রই হোন না কেন, আপনার অতিবৃদ্ধ মা/বাবাকে কালীঘাটের 'নির্মল হৃদয়' আশ্রমে কোনও দিনই স্থান দেওয়া হবে না।

সাধারণ মানুষ যেমন মাদার টেরিজার চাতুরীর ব্যাপার বোঝে না, তেমনই মিশনারী পাদ্রী ও স্কুলের ফাদারদের ব্যাপারও বোঝে না। সবায়ের একান্ত লক্ষ্য ধর্মান্তর করা। বস্তুত উনিশ শতকে আলেকজান্ডার ডাফ দেখিয়ে গেছেন স্কুল খুলে কেমন শিকার ধরা যায়। আজ শহরের বুকে অতো সহজে ধর্মান্তর করা না গেলেও এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় না। আজও মিশনারী স্কুলে ধর্মান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়, সাধারণভাবে হিন্দু ছাত্ররা গররাজী হলেও দু একটি দরিদ্র ছাত্র সুযোগ সুবিধার বহর দেখে রাজী হয়ে যায়। পরের বছর নাম ডাকার খাতায় অতিরিক্ত একটি খ্রিষ্টান নাম দেখা যায় তার। অবশ্য ছাত্র যদি তপশিলীভুক্ত হয়, তবে খ্রিষ্টান নামটি সে ব্যবহার করে না; পাছে ঐ শ্রেণীর প্রাপ্য সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

আজকের সাধারণ মানুষের চোখে পাদ্রী বা ফাদার-মাদারদের খুব সুসভ্য দেখতে লাগলেও মিশনারীদের অতীত বড়ই রক্তাক্ত। সারা ইউরোপের প্রতিমা পূজকদের কচুকাটা করে, তাদের বাড়ী ঘর মশালের পর মশাল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ইউরোপকে যে খ্রিষ্টান করা হয়েছিল, তা মিশনারী স্কুলের একটি ছাত্রও জানে না। কলম্বাসের ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবিষ্কারের পর থেকে আবিষ্কৃত হলো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। কোনওটাই জনহীন প্রান্তর নয়। প্রচুর মানুষ বাস করতো ওই দুটি দেশে। একই সঙ্গে নব আবিস্কৃত অস্ট্রেলিয়াতেও বাস করতো বহু মানুষ। তাদের মেরে মেরে শেষ করে মিশনারীরা তাদের সন্তানদের খ্রিষ্টান করে বড় বড় দেশগুলির জনচরিত্রই পাল্টে দিল। শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকাতেই অবলুপ্ত হয়েছে দু শো পঞ্চাশটি আদি জাতি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কথিত ২৫০ টি ভাষাও। এ খবর কি জানে সাধারণ মানুষ? তেমনই, কেমন করে পশ্চিম এশিয়া রক্তাক্ত করে ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল সেটাই বা কজন জানে?

আজকের মানুষরা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের দ্বারা মুসলমান উগ্রপন্থীদের কীর্তিকলাপ অনেক কিছুই দেখছে। কিন্তু কমিউনিষ্ট ও সেকুলারবাদীরা প্রাণপণে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, এ ধরণের ঘটনার সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যাপারগুলি নিছক কিছু উগ্রপন্থী মুসলমানের কাজ। কিন্তু উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির নাম দেখলেই বোঝা যায় এগুলি জেহাদী সংগঠন। জেহাদ যারা করে তাদের বলে মুজাহিদ। বহুবচন মুজাহিদীন। 'হিজ্‌ব উল মুজাহিদীন' মানে মুজাহিদীনদের সংগঠন। সাধারণ মানুষেরা মুসলিম দুর্বৃত্তদের কার্যকলাপ, পাকিস্তান, সৌদি আরব ও ইরাণের ইসলামী শাসন দেখে এবং পাকিস্তানী সেনা, আইএসআই, তালিবান, আর্ন্তজাতিক ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের এবং অতি সাম্প্রতিককালের আইসিস এর কার্যকলাপ দেখে, দেশবহিস্থ রোহিংগা মুসলমানদের ভারতে জড়ো করার জন্য ভারতের মুসলমানদের প্রয়াস দেখে, বকর ঈদের সময় ব্যাপক গোহত্যা দেখে মুসলমানদের সুনজরে দেখে না। কেউ মুসলমানপাড়ায় বাড়ী কিনে বাস করার সাহস দেখায় না। এবং নিজেদের

পাড়াতে এসে কোন মুসলিম বাড়ী কিনুক এটাও চায় না সাধারণ মানুষ। বাড়ীতে মুসলিম পেয়িং গেস্ট রাখার কথাও ভুলেও কেউ চিন্তা করে না। নিজের মেয়ে মুসলমান বিয়ে করেছে, এটা দেখে কজন হিন্দু সুখী হয়?

- বিপরীত দিকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের জনসংযোগের ব্যাপারটা অসাধারণ। যদিও ঘটনা বলে খ্রিষ্টান মিশনারীরা স্কুল ও হাসপাতালের মাধ্যমে তাদের ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া চালায়, এতৎসত্ত্বেও তারা নানাভাবে একটি সন্তের চরিত্রে পরিণত হয়েছে। নোবেল লরিয়েট ভারতীয় মাদার টেরিজার ছবি থানায়, সরকারী অফিসে ও অসংখ্য ভারতীয়ের বাড়িতে শোভা পায়। পাশে হয়তো থাকে মহাত্মা গান্ধি বা নেতাজীর ছবি। এবং তাঁর নাম স্মরণ করে সবাই— স্কুলের ছাত্রী থেকে বিউটি কন্টেস্টে যোগদানকারী সুন্দরী যুবতীরাও। তাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় চরিত্র। ঐ একটি চরিত্র খ্রিষ্টান প্রচার যন্ত্রকে একশো গজ এগিয়ে দিয়েছে। বলিউডের ফিল্মে হিন্দু পুরোহিতদের সর্বদা কুচরিত্রের দেখানো হয়। বিপরীতে ফিল্মের খ্রিষ্টান ফাদার ও নানরা সবসময় করুণার প্রতিমূর্ত্তি। তাদের সর্বদা দেখা যায় যখন কোনও নায়িকা, শিশু বা বৃদ্ধ বিপদে পড়ে। তারা সবসময় কথা আরম্ভ করে 'মাই চাইল্ড' বলে। যদিও আন্তর্জাতিক মহলে তাদের বদনাম শিশুধর্ষক হিসাবে। এইভাবে হিন্দুর চোখে খ্রিষ্টান মিশনারীরা সবসময় 'সন্ত' বলে পরিচিত হয়, যদিও আন্তর্জাতিক মহলে চতুর, নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক বলে তাদের বদনাম। ভারতীয় সমাজ ক্রমশঃ প্রতীচ্যমুখী হয়ে ওঠায় পঁচিশে ডিসেম্বর খ্রিষ্টমাস নিয়ে তাদের হৈ হুল্লোড় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এইসব নানা কারণে জগতের অন্যত্র যখন গীর্জা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তখন ভারতে এটা ক্রমবর্দ্ধমান।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই নিঃশব্দ মৃত্যুদূতরা জেহাদী মুসলিমদের মতোই ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর।

ইসলাম ও খ্রিষ্টানীর পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীদের ধর্ম

বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলুইন বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম না বুঝলে আদিবাসীদের ধর্ম বোঝা যা না। আর বৌদ্ধধর্ম না বুঝলে উত্তর-পূর্বের আদিবাসীদের ধর্ম বোঝা যায় না। আদিবাসীরা জন গণনার সময় নিজেদের সর্বদা হিন্দু বলে ঘোষণা করেন। এতৎসত্ত্বেও মিশনারীরা স্বাধীনতার আগে স্থির করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের রেহাই দিয়ে ধর্মান্তরকরণের জন্য আদিবাসী ও তপশীলিভুক্ত জাতিদের তাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে।

কিন্তু আদিবাসীদের পূজা প্রার্থনা, গান-উপকথা সবই চলে ভারতীয় ভাষায়। তাদের পোষাক-আষাক সবই ভারতীয়। এগুলি ভারতের কোনও নাকোনও জায়গার। তাদের সব কিছুই তাদের ভারতীয় পূর্বপুরুষদের অনুসরণ। এইসব ভৌগোলিক ঘটনাগুলি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ডঃ আম্বেদকার সমস্ত আদিজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতিদের একটি শ্রেণীর মধ্যে ফেলেছিলেন।

এর বাইরে ছিল ইসলাম খ্রিষ্টানী, জৌরাষ্টীয়রা ও ইহুদীরা। কিন্তু জৌরাষ্টীয়রা ও ইহুদীরা ধর্মান্তর করেনা, কিন্তু খ্রিষ্টানী ও ইসলাম তা করে। সুতরাং তিনি বললেন, দলিতরা যদি ইসলাম বা খ্রিষ্টানী গ্রহণ করে তবে তারা শুধু হিন্দুধর্মের বাইরে যাবে না, হিন্দু সংস্কৃতিরও বাইরে চলে যাবে। সুতরাং তারা বিজাতীয়তে পরিণীত হবে। সেটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে যাবে।

আদিবাসীদের ধর্মসম্পর্কে খ্রিষ্টান মিশনারীদের বক্তব্য—তারা ভূত-প্রেতের উপাসক। তারা হিন্দু নয়। হিন্দুধর্মে কী কী আছে? প্রতিমাপূজা, টোটেমে বিশ্বাস, পঞ্চভূতের পূজা, বৃক্ষ, জীবজন্তুর পূজা, প্রকৃতিপূজা, জন্মান্তরে বিশ্বাস, গুরু পূজা, পূর্বপুরুষদের পূজা, ইত্যাদি। এইসব ব্যাপারগুলি খ্রিষ্টানীতে কখনই বরদাস্ত করা হয় না। কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে আদিবাসীরা বিনা বাধায় তাদের ধর্মাচরণ করে যায়।

এটা আমাদের বুঝতে হবে আদিবাসী সমেত সকল শ্রেণীর হিন্দুদের বাঁচানো দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে আমাদেরই গ্রহণ করতে হবে। সারা বিশ্বের মিশনারীরা কিন্তু এই শতাব্দীর মধ্যেই ভারতকে ফসল তোলার মতো নিজেদের বস্তায় ভরে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অটল বিহারী বাজপাইকে পাশে দাঁড় করিয়ে পোপ জন পল এমন কথাই উচ্চারণ করে গেছে।

খ্রিষ্টান মিশনারীদের বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা

খ্রিষ্টান দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ হলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। এর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ খ্রিষ্টানরা সবচেয়ে ধর্মান্ধও বটে। এদের কাছে গিয়েই মাদার টেরিজা বলতেন, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহ গড়াগড়ি দেয়। সুতরাং সেই মৃতদেহগুলি সৎকার করার জন্য আমাকে ডলার দাও।

পোপ জন পল যেমন একবিংশ শতকে গোটা দক্ষিণ এসিয়া থেকে খ্রিষ্টান ফসল তুলে বস্তাবন্দী করার পরিকল্পনা করেছে, তেমনই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা বিপুল অর্থব্যয়ে গোটা পৃথিবীকে খ্রিষ্টানে টইটুম্বর করার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই পরিকল্পনার একটি হলো **জোশুয়া প্রজেক্ট**।

জোশুয়া প্রজেক্ট (পূর্বতন এডি ২০০০ এর অংশ) হচ্ছে যা পৃথিবীতে খ্রিষ্টানীতে দীক্ষিত না হওয়া জাতিগুলিকে জাতি-ভাষা-দেশ ভিত্তিকভাবে শনাক্ত করা। এইভাবে যে তথ্যপুঞ্জ সৃষ্টি হয় মিশনারীদের ধর্মান্তরে সাহায্য করে তা। জোশুয়া প্রজেক্টের মূল অফিস আমেরিকার কলোরাডো স্প্রিংসে।

জোশুয়া প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ এ, পূর্বতন এডি ২০০০ এবং বিয়ণ্ড মুভমেন্ট থেকে। ২০০১-২০০৫ পর্যন্ত জোশুয়া প্রজেক্ট বিভিন্ন সময়ে বিনা চুক্তিতে *ক্যালেব প্রজেক্ট,*

আই.সি.টি.এ ও *ওয়ার্ল্ড হেল্প* ইত্যাদি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২০০৬ সালে জোশুয়া প্রজেক্ট চুক্তিবদ্ধভাবে ইউএস সেন্টার ফর ওয়ার্ল্ড মিশনের একজন অংশীদার হয়।

জোশুয়া প্রজেক্ট বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠীকে ভিত্তি করে একটি তথ্যপঞ্জী তৈরী করে "পৌঁছতে না পারা জাতিগোষ্ঠীর"। ২০১০ পর্যন্ত তারা ৯৮০৩ জাতিগোষ্ঠীকে শনাক্ত করে। এগুলিকে আবার দেশ ভিত্তিকভাবে ভাগ করে পাওয়া যায় ১৬৩৫০ টি জাতিগোষ্ঠী, যারা পৃথিবীর ২৩৬ টি দেশে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী হিসাবে ছড়িয়ে। এই জাতিগোষ্ঠীগুলিকে আবার ২৫১ টি জাতিপুঞ্জে বিভক্ত করা হয়েছে, যেগুলি ১৬ টি ব্লকে বিভক্ত। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী ৬৫১০ টি ভাষার অন্তত একটিতে কথা বলে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে জোশুয়া প্রজেক্ট পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নষ্ট করতে চায়। তারা চায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একটিমাত্র একদেবতার আরাধনা করুক।

SIL ইন্টারন্যাশন্যাল

সামার ইন্সিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিক (SIL) একটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠান যার কাজ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার তত্ত্ব নিয়ে। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মার্কিণ প্রেসবিটারিয়ান পাদ্রী উইলিয়াম ক্যামেরন টাউনসেন্ড, যিনি গুয়াতেমালাতে মিশনারীগিরি করছিলেন *কাকচিকেল* মায়া সভ্যতার মানুষদের মধ্যে। তিনি কাকচিকেল মায়াদের ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করলেন। এরপর তিনি একই উদ্দেশ্যে রওনা হলেন মেক্সিকোতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেক্সিকোর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুললেন প্রথমে। তারপর ভাষা মিশনারীদের সেখানে কাজ করার বন্দোবস্ত করলেন। ভাষা শেখানোর পাশাপাশি বাইবেল অনুবাদের কাজও চললো স্থানীয় ভাষায়। এইভাবে SIL তার কাজের পরিধিও বাড়িয়ে চললো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। স্থানীয় ভাষার শিক্ষার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা ও কর্মীদের দ্বারা স্থানীয় মানুষদের খ্রিষ্টানীতে দীক্ষা দেওয়া।

আপাতদৃষ্টিতে SIL এর কাজ প্রশংসনীয় মনে হলে ইউনেস্ক SIL কে স্বীকার করলো; বা, জাতিসংঘে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাঁদা সবসময়ে বেশী হওয়ার জন্য ইউনেস্কোকে দিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার প্রচার করলো। এমন কি ম্যাগসেসে পুরষ্কারও দেওয়া হলো SIL কে। কিন্তু SIL একটি নির্লজ্জ শয়তানি ছাড়া কিছু নয়। জোশুয়া প্রজেক্টের মতো SIL এর মূল উদ্দেশ্য ভাষা শিক্ষার নাম করে খ্রিষ্টানীর প্রসার।

AD 2000 এবং Beyond Movement

বেশ কিছু খ্রষ্টান মৌলবাদীরা ১৯৮৯ এ সিঙ্গাপুরে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল। তার কারণ, এই মৌলবাদীদের ধারণা ছিল ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে গোটা পৃথিবীতে কিলবিল করবে

শুধুমাত্র খ্রিষ্টানরা। সেই উদ্দেশ্যে কার্যক্রম ছকা হয়েছিল যাদের কাছে খ্রিষ্টের মঙ্গলবাণী (গসপেল) পৌঁছয় নি তাদের কাছে কীভাবে তা পৌঁছে দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় একটি সম্মেলন হয় ১৯৯৬এ দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে। সেখান থেকে আন্তর্জাতিক ডিরেক্টর লুইস বুশ একটি প্রতিবেদন লেখেন। সেই প্রতিবেদনে বাইবেলের বাক্যাবলীর অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা করে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হলো যে বিধাতা পৃথিবীর তামাম মানুষদের খ্রিষ্টান করার ন্যায্য অধিকার খ্রিষ্টানদের দিয়েছেন। যেমন, বাইবেলে আছে, আব্রাহামকে বিধাতা বলছেন: "এই দেশ আমি তোমার উত্তর পুরুষদের দেব। মিশর নদ এবং ফরাৎ নদের মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগ আমি তাদের দেব।"

ধর্মান্ধ লুইস বুশ এর ব্যাখ্যা করেছে, "নদীগুলি হচ্ছে বিধাতার মানুষদের প্রবাহ, যারা বিধাতার উপস্থিতি স্বীকার করছে, বিধাতার শান্তি উপভোগ করছে, বিধাতার জীবন উপকরণ গ্রহণ করছে। বিধাতার শক্তির বহর জেনে বিধাতার পরিকল্পনা সফলের করার ব্যাপারটা জানে। বিধাতার মানুষরা গতিময়, এটা উষর শুষ্ক পৃথিবীতে একটি আধ্যাত্মিক জীবনের অনুপ্রেরণা।"

এইভাবে এই ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানরা নানা বানানো কথা দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে সারা পৃথিবীর মানুষকে খ্রিষ্টান করার নৈতিক দায়িত্ব খ্রিষ্টানদের।

১৯৭৪ সালে লুসানু সমাবেশে একশো পঞ্চাশটি দেশ থেকে আগত আড়াই হাজার ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান সর্বাত্মকরণে তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে :

(ক) স্থানীয় ভাবে ও পৃথিবীজুড়ে ধর্মান্তরকরণ করার জন্য জনগণের মধ্যে দূরদৃষ্টি ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে।

(খ) যে পদ্ধতিতে ধর্মান্তরকরণ সফল হয় সেই পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জনগণকে জানাতে হবে।

(গ) ধর্মান্তরকরণে সর্বদা সহায়তা করতে হবে।

এই মৌলবাদী বাইবেল থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়েছে। তার মধ্যে আছে: খ্রিষ্টের আদেশ, "সমস্ত জাতি থেকে শিষ্য কর।" ম্যাথু-২৮.১৯

আবার মার্কের মঙ্গলবাণী থেকে: "সমস্ত প্রাণীকে মঙ্গলবাণী শেখাও।" মার্ক-১৬.১৫

"আমি এই পাথরের উপরই আমার মণ্ডলী গেথে তুলবো। মৃত্যুর কোনও শক্তি তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না।" ম্যাথু-১৬.১৮

শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অসম্পূর্ণ কাজের অনেকটাই করা গেছে। আশা করা যায় ২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৯৯ শতাংশ মানুষের কাছে যিশুর মঙ্গলবাণী পৌঁছে যাবে।

ধর্মান্তরের সৈনিক তো প্রস্তুত। কিন্তু এর জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ জোগাবে কে? সে অর্থ জোগানের জন্য প্রস্তুত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র; তার অর্থের ঝুলি নিয়ে।

কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও রকম লাভের কাজ করে না, তাদের বাৎসরিক ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ণ দিতে হয় ফর্ম ৯৯০ তে। কিন্তু কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান, যাদের ধর্মীয় কাজ আছে, তাদের ঐ ৯৯০ ফর্ম জমা দিতে হয় না। যেমন, টেক্সাস ভিত্তিক গসপেল ফর এসিয়া, মিচিগান ভিত্তিক মিশন ইন্ডিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক গুড নিউস ফর ইন্ডিয়া। এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর টাকা আসে ভারতে। ভারতে বিভিন্ন সংস্থা, যাদের চলতি কথায় বলা হয় NGO, তারা এই টাকা গ্রহণ করতে পারে যদি তাদের FCRA এ আইন অনুযায়ী অনুমতি থাকে। FCRA অনুমোদিত ২২০০০ এনজিও আছে ভারতে যাদের প্রতিবছর ডিসেম্বরে এফ সি - ৬ ফর্মে রিটার্ন দিতে হয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এইসব রিটার্ন তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। এইসব কিছু NGO আমাদের আলোচনার বস্তু। এই সমস্ত NGO রা যে ৯৯০ নং ফর্ম ভর্তি করে, তাতে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখে, চার্চ প্লান্টিং। এই চার্চ কথাটির দু রকম মানে হয়— একটি হচ্ছে গীর্জা; অন্যটি ধর্মমণ্ডলী। একটি গীর্জার অনুসঙ্গ হচ্ছে তার আরাধনা পদ্ধতি। সেই আরাধনা পদ্ধতি যতোজন মানে তাদের সম্মিলনকেও চার্চ বলা হয়। দক্ষিণ ভারতের একটি চার্চের অনুসারীরা উত্তর ভারতে গিয়ে কিছু লোককে খ্রিষ্টান করলো। সেখানে গীর্জা না থাকলেও কোনও একটি ঘরে বসে তারা যা আরাধনা করবে তা ঐ দক্ষিণভারতীয় চার্চের নির্ধারিত আরাধনা। ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা বাড়লে তখন সেখানে একটি গীর্জা তৈরী হবে।

ইংরেজী প্ল্যান্ট কথাটির অনেক অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে একজনের মনের বার্তা অন্যের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া। ধর্মান্তরিত করাও এই ব্যাপার। এখন এই চার্চ প্লান্টিং করার খাতে কী পরিমাণ টাকা বিদেশ থেকে ভারতে ঢোকে তা দেখা যাক : এসিয়ান পার্টনার্স ইন্টারন্যাশনাল ইন্ক APII, লুবক, টেক্সাস একটি মার্কিণ দানসত্র। এর ২০১২ সালের ফর্ম ৯৯০ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৪৭৫৯১ টি 'চার্চ প্লান্টিং' হয়েছে উত্তর ভারত চার্চ প্লান্টিং আন্দোলনের মাধ্যমে। সামাজিক কাজ, ধর্মান্তর ও চার্চ প্লান্টিং এর জন্য ৩০৯৮৯০ ডলার পাঠানো হয়েছে এই সংস্থাকে। এখন এক ডলার সমান ৫২ টাকা যদি ধরা যায়, তবে ২০১২ সালে APII পাঠিয়েছে এক কোটি বাট লক্ষ টাকা।

কিন্তু এই টাকা পেল কে? একটা সংস্থা হলো এসিয়ান সহযোগী সংস্থা ইন্ডিয়া (ASSI)। ঠিকানা ৪২ জেল রোড, গীতা বাটিকা, গোরক্ষপুর; উত্তর প্রদেশ। ASSI একটি FCRA-NGO এর দাতারা হচ্ছে, APII এবং ইন্টার-অ্যাক্ট সুইডেন। এর দান প্রথমটির এক তৃতীয়াংশ।

হিসাব করে দেখা যাচ্ছে গোরক্ষপুরের সংস্থাটি ২০০৬ থেকে ২০১৩ র মধ্যে টেক্সাসের সংস্থা থেকে ১২.৩৪ কোটি টাকা পেয়েছে। টেক্সাসের সংস্থাটি ডলার দান করছে চার্চ প্লান্টিং এর জন্য। কিন্তু গোরক্ষপুরের সংস্থাটি জানাচ্ছে, টাকা খরচ হয়েছে অন্য কাজে।

দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, ভারতের জনগণ টেক্সাসের সংস্থাটিরও নাম শোনেনি, শোনেনি গোরক্ষপুরের সংস্থাটির নামও। কিন্তু তাদের অজান্তে লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতে আসছে এদেশের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য।

আরও উদাহরণ:

দাতা : মার্কিণ দানসত্রের নাম : গ্লোবাল হোপ ইন্ডিয়া, র‍্যালে,নর্থ ক্যারোলিনা,

গ্রহীতা : ইন্ডিয়ান খ্রিষ্টান মিনিট্রিজ, কভেনান্ট সিটি, ওঙ্গলে, অন্ধ্র প্রদেশ

দাতা : মার্কিণ দানসত্রের নাম: মাস্টার্ড সিড ফাউন্ডেশন, ফলস চার্চ, ভার্জিনিয়া

গ্রহীতা: CEEFT সাপ্লাই সেন্টার ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, নাচারাম

দাতা: হাউস 2 হাউস মিনিস্ট্রিজ, ওরিগণ

গ্রহীতা: গ্রেটার ইন্ডিয়া ডুন রিসার্চ একাডেমী IE, নাচারাম, হায়দ্রাবাদ

দাতা: ইন্ডিয়া গসপেল আউটরিচ, ক্যালিফোর্নিয়া

গ্রহীত। : ১) কে ই আব্রাহাম ফাউন্ডেশন, তিরুভাল্লা, কেরালা

২) বেরাচা চার্চ অব গড, পালাম পুর, হিমাচল প্রদেশ

দাতা : আলফা মিনিট্রিজ ইঙ্ক, ভার্জিনিয়া

গ্রহীতা : আলফা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ব্যাঙ্গালুরু । টাকা ব্যবহার হয়, ভাদোদারা, গুজরাটে

দাতা : নিউ ইন্ডিয়া ইভানজেলিস্টিক এসোসিয়েশন, মিচিগান,

গ্রহীতা : নিউ ইন্ডিয়া ইভানজেলিস্টিক এসোসিয়েশন, তিরুবন্তপুরম। কার্যক্ষেত্র, পূর্ণিয়া বিহার।

বিদেশ থেকে সব কটি দানসত্রই টাকা পাঠিয়েছে 'চার্চ প্লান্টিং' করার জন্য। এতে তাদের ট্যাক্স মকুব হয়েছে। কিন্তু ভারতে গ্রহীতা সংস্থাগুলি তা করছে না। তারা অন্য খাতে সে টাকা খরচ করছে। সম্ভবত FCRA-NGO গুলি তাদের রিটার্নে এমনতর কথা লিখলে তাদের NGO লাইসেন্স বাতিল করা হবে। যে সমস্ত জায়গায় 'চার্চ প্লান্টিং' হচ্ছে, সেখানকার মানুষ যা উপাসনা করে তা কোনও না কোনো ভাবে হিন্দুধর্মের অর্ন্তভুক্ত। ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা তাদের এই হিন্দু যোগসূত্র কেটে দেবে হিন্দুধর্ম উৎসাদনের ব্রত নিয়ে।

আর একটা ঘটনা : এই FCRA-NGO গুলি ভারতের এক রাজ্যে রেজিস্ট্রিকৃত কিন্তু তারা কাজ করছে অন্য রাজ্যে।

আমাদের দেশে অনেক উদারমনা হিন্দু আছেন, যারা প্রশ্ন করবেন, হিন্দুরাও তো বিদেশে মন্দির তৈরী করছে; আমেরিকায়, ইংলন্ডে, কেনিয়ায় ? সুতরাং খ্রিষ্টানদের চার্চ তৈরী করায় আপত্তি কেন ?

এর উত্তর : চার্চ মানে সবসময় ইমারতটিকে বোঝায় না। ইমারতের নির্দিষ্ট উপাসনা প্রণালীতে যারা উপাসনা করে তাদের সমষ্টিকেও বোঝায়। এই সমষ্টিকে বলে ধর্মমণ্ডলী। আর প্লান্টিং শব্দটির একটি অর্থ কোনও মত অন্যের কানে ঢোকানো। বাইবেলে আছে, "যাও সমস্ত জাতি থেকে আমার শিষ্য করো।" এই আদেশকে সমস্ত খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে। তাদের মিশনারীবৃত্তির উৎস বাইবেলেব এই ধরণের বাণী।

কিন্তু হিন্দু মন্দির তৈরীর জন্য ভারত থেকে কোনও টাকা যায় না। বিদেশে কোনও হিন্দুও তৈরী হয় না ধর্মান্তর করে। যে দেশে মন্দির তৈরী হয় সেখানকার হিন্দুরাই টাকা পয়সা খরচ করে মন্দিরের জন্য। মন্দিরে নানা উৎসবও হয় স্থানীয় হিন্দুদের পয়সায়।

ভারতে মোট এগারো হাজার কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আসে দানের মারফৎ। এর একের তিনভাগ আসে খ্রিষ্টান NGO মারফৎ। আর একের তিন ভাগ আসে FCRA-NGO র কাছে, যারা স্বীকার করে না যে তারা মিশনারী। যেমন গোরক্ষপুরের সংস্থাটি।

NDA শাসন ক্ষমতায় আসার ফলে অসন্তুষ্ট খ্রিষ্টান মৌলবাদীদের আগুন ছড়ানো বক্তব্য

প্রিয় প্রার্থনা সহযোগী ও সমর্থকরা
লেখক : ডেভিড মরিস
প্রকাশক: আর্কাইভ টু ডে
তারিখ : ১৬ ই মে ২০১৪
URL; http. //archiv.today/hsYLM

আর এস এস তার রাজনৈতিক দল বিজেপীর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার দখল করেছে। তারা দখল করেছে ৫৪৪ সদস্যের লোকসভার ৩৩০ টি সদস্য, এর মধ্যে ২৭২ টি সিট বিজেপীর নিজস্ব। আমরা অনেকমাস ধরে প্রার্থনা করছি যাতে গড তাঁর ইচ্ছা পরিষ্কার করে জানাবেন সাউথ ইন্ডিয়া চার্চ অফ ক্রাইষ্ট মিশন এবার কি কাজ করবে। এটা কি একটা ভীতিপ্রদর্শনের সময় অথবা আগেকার বিজেপী-আর এস এস নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের মতো বহু সময় চার্চের উপর আক্রমণ থেকে মুক্ত? এটি হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো চিন্তার বিষয় ইস্টার পালন এবং ব্যক্তিগত ধর্মান্তরকরণের সময়।

গড তাঁর ইচ্ছা আজ জানিয়ে দিলেন। আমরা এই শতাব্দীতে খ্রিষ্টের চার্চের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় ভীতিপ্রদর্শনের সময় শুরু করলাম। নির্বাচনের ফল এর চেয়ে বেশী পরিষ্কার হতে পারে না। হিটলারের নাজি পার্টির ভারতীয় শাখা হলো আর এস এস। ওরা থামবে না, যতক্ষণ না ভারতকে ওরা হিন্দুত্ব নামক হিন্দুধর্মের মাতৃভূমি করে তুলতে পারে। হিন্দুত্ব হিটলারের আর্যবাদের মতো। সাধারণ হিন্দুরা যাকে হিন্দুধর্ম বলে বিশ্বাস করে তার থেকে হিন্দুত্ব অনেক দূরে। কারণ, হিন্দুত্বের অনুসারীকে রাম নামক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হয়। আর এস এস তাদের পুরোহিত। ওরা নির্মম এবং শয়তানের শক্তি দ্বারা চালিত।

ভারতের হিটলার নরেন্দ্র মোদী অর্থের জোরে, ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে আর এস এসের পূর্ণ সময়ের সন্তদের মাধ্যমে পার্লামেন্টে অর্ধেকেরও বেশী সিট অধিকার করে এখন পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রক। নরেন্দ্র মোদীর চেহারা ও দৃষ্টি পুরানো আমলের স্বেচ্ছাচারীদের মতো।

এটা ঘটনাচক্রে ঘটেনি। তার নির্বাচনী প্রচার হিটলারের মতো যখন তিনি ১৯৩৩ এ ক্ষমতায় এলেন; প্রত্যেকের জন্য কিছু কিছু, বিশেষ উল্লেখ না করেই। নরেন্দ্র মোদী যদি পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তবে সেটা হবে সাংঘাতিক ব্যাপার। সংবিধান দেশের নাগরিকদের পছন্দমত একটি ধর্মের সদস্য হতে অধিকার দিয়েছে।

এটা পরিষ্কার, ভারতের মানুষরা খ্রিষ্টানদের ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য ভোট দেয় নি। মোদি একটা বিশাল মিথ্যা কথা বলছে, আর এস এস ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা শুধুমাত্র দেশের উন্নতি চায়। বিশেষ কোনও বার্তা নয়, শুধু আমাদের ভোট দাও, তোমরা যা চাইবে তা পাবে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই ভোটের সঙ্গে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের ভীতিপ্রদর্শনও চলবে। এবং আগের মতো চাকরীও জুটবে না। আমি প্রত্যাশা করছি, একটা প্রবল দুর্নীতি হবে এবং ভারতের সংবিধানকে নষ্ট করার চেষ্টা হবে, যা আগে দেখা যায়নি। সঙ্গে থাকবে বহু হিংসার কাজ, মোদির পুলিশ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকার দরুন।

এর সঙ্গে আর একটা খারাপ খবর হচ্ছে জয়াললিতার প্রবলভাবে জয়লাভ। জয়াললিতা তামিলনাড়ুর এআইডিএমকে'র দলের নেত্রী। তাঁর দল চল্লিশটির মধ্যে আঠত্রিশটি সীটে জিতেছে। সুতরাং তিনি এখন তামিলনাদুর একনায়িকা। এই জয়াললিতাই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যখন ১৯৯৯ এ আর এস এস ক্ষমতায় আসে। তিনি তামিলনাদু এন্টিকরভারসন ল চালু করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ও তামিলনাদু সরকার দুই সরকার মিলে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে তামিলনাদু অ্যান্টি করভারসন ল চালু করে, যেটা ২০০৪ সাল অব্দি চলে। তারা কোনও মানুষের ব্যাপ্তিস্ম নিষেধ করে। নিষেধ ভঙ্গ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য দু বছর কারাদণ্ড ও দু হাজার ডলার জরিমানা। আপনারা যারা আমাদের প্রার্থনার সাথী এবং সমর্থক সেই পাঁচ বছরের খোলাখুলি দমনের কথা স্মরণ করতে পারবেন।

চার্চের উপর আক্রমণ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উপর পীড়ন এত বেশী হয়েছিল যে ২০০৪ সালে কংগ্রেস দল বিশ্রীভাবে হারিয়ে দিল আর এস এস / বিজেপীকে। এর মধ্যেও গুজরাটের ডাংসে ও ওড়িষ্যায় চার্চের উপর আক্রমণ হয়েছিল। দুটিই আর এস এস এর আক্রমণ। ২০০৪ থেকে ২০১৪ র মধ্যে ভারতের খ্রিষ্টানরা হাজার হাজার খ্রিষ্টান তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে।

খ্রিষ্টান মৌলবাদী ডেভিড মোরিসের বক্তৃতা শেষ হলো। এই সময়ের মধ্যে গুজরাটের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা ডাংসে মিশনারীদের চালাকির ফলে বেশ কিছু আদিবাসী ধর্মান্তরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজ থেকে প্রতিবাদও আসে। এসব কথা আগেই বলেছি। ওড়িষ্যার কান্ধামালে আদিবাসীদের চালাকি করে ধর্মান্তর প্রতিরোধ করতে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ নামে এক

সন্ন্যাসী একটি বনবাসী কল্যাণ আশ্রম চালাতেন। এর ফলে খ্রিষ্টান মৌলবাদীদের ধর্মান্তরকরণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ফলে মাওবাদীদের সাহায্য নিয়ে খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে সহযোগী সমেত এ কে-৪৭ দিয়ে হত্যা করে। এর থেকে বোঝা যায় মাওবাদীদের সঙ্গে মিশনারীদের একটা আঁতাত আছে। মামলায় মাওবাদী ও খ্রিষ্টান গুণ্ডাদের কারাদণ্ড হয়। এই আঁতাতের আর একটা প্রমাণ হলো ছত্রিশগড়ে ইভাঞ্জেলিক্যাল মিশন হসপিটালের চিকিৎসক বিনায়ক সেন মাওবাদীদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন। এইসব ব্যাপারে ছত্রিশগড় পুলিশ যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল। পুলিশ বিনায়ক সেনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে দেশদ্রোহের অভিযোগ করে। সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয় হাইকোর্টেও। এর পরে এগিয়ে আসেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধি। তিনি বিনায়ক সেনকে পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে একটি পদে নিয়োগ করেন। ফলে ছত্রিশগড় সরকার তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ইভানজেলিজম কথাটির অর্থ ধর্মান্তর করা।

আগে আমরা বর্ণনা করেছি কীভাবে অতীতে মিশনারীরা হিন্দুধর্মকে গালিগালাজ করতো। এই হিন্দুধর্মকে গালিগালাজ করার প্রথা আজও কিন্তু লুপ্ত হয়নি। এর একটা উদাহরণ এখন দিচ্ছি।

কিছু বছর আগে ক্যাথলিক চার্চ সমেত বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা শোরগোল তুলেছিল যে রাজস্থানে মিশনারীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তখন রাজস্থানে বিজেপিই ছিল ক্ষমতায়। বসুন্ধরা রাজে মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং একদিক থেকে চার্চ ও অন্যদিক থেকে প্রচার মাধ্যমের আক্রমণ এলো।

এই আক্রমণের কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি হিন্দী বই নাম, *হকিকত*। যেটি বিনাপয়সায় দেওয়া হচ্ছিল রাজস্থানের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে। দাতা ছিলেন এমানুয়েল মিশন ইন্টারন্যাশনালের আর্চ বিশপ, এম এ টমাস ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র রেভারেন্ড স্যামুয়েল টমাস।

কি লেখা ছিল এই বইয়ে? কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হলো হকিকত থেকে। যা দিয়ে রাজস্থানের কোটাতে টমাস পিতাপুত্র ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ভারতের হিন্দু অধিবাসীদের বলেছিল তোমরা নিজেদের ধর্ম ছাড় ও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করো।

"হিন্দু দেব ও দেবীরা কাল্পনিক ও উদ্ভাবন করা হয়েছিল দলিতদের নিষ্পেষণ করার জন্য।" (পাতা-৯)

"আদিবাসীদের জ্ঞানার্জন বন্ধ করতে সরস্বতী উদ্ভাবন করেছিলেন কঠিন বেদসমূহ।" (পাতা-১৬)

"সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাদের অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হয় এবং তারা পাজী ও অত্যাচারী দেব ও দেবীদের অস্বীকার করতে থাকে। কিন্তু ভারতে মানুষেরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমর্জিত থাকার কারণে কাল্পনিক দেবদেবীরা আজও পূজিত হয়।" (পাতা-১৭)

"নগ্ন সন্ন্যাসীরা হিন্দু নারীদের দ্বারা পূজিত হয়। যখনই নারীরা সন্ন্যাসীদের দেখে তখন তাদের সামনে শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। মহিলারা সন্ন্যাসীর লিঙ্গে জল ঢালে এবং সেই জল পান করে আনন্দের সঙ্গে। এই সমস্ত বিশ্রী ব্যাপার দেখে লিঙ্গ দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন। এই সমস্ত মানুষরা অজ্ঞান এবং ভালো মন্দ বিচার করতে জানে না।"

"রামের ইচ্ছা অনুযায়ী সীতাকে বনের মধ্যে পরিত্যক্ত করা হয়।.....রাম পরে লক্ষ্মণকে বলেন সীতাকে হত্যা করতে। শেষে, রাম জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরযূর জলে জীবন বিসর্জন দেন। অর্ধনগ্ন ঋষিদের শিক্ষাই এমন, যাঁরা হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা প্রশংসিত হন।" (পাতা-১০০)

"যাতে পৃথিবীর মানুষরা তাকে পূজা করে, শিব নিজের লিঙ্গটি পৃথিবীতে ফেলে দিলেন, ফলে পৃথিবীর মাটি ও আকাশ কেঁপে উঠলো। বেচারী ধরিত্রী দেবী, নড়ে চড়ে উঠলেন লিঙ্গের ভারে। এটা দেখে সমস্ত দেবতারা ভয় পেয়ে গেলেন। মনে হলো দেবতারা তাদের লিঙ্গগুলি বোমা হিসাবে ব্যবহার করবেন। যখন যেখানে ইচ্ছা হবে, মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য, তাঁরা তাদের লিঙ্গ বোমাগুলি ফেলে দেবেন। কিন্তু বিদেশী বোমার তুলনায় এই লিঙ্গ বোমাগুলি সেঁতানো।" (পাতা-১০৬-১০৭)

"(রামকৃষ্ণ)পরমহংসদেবের জানা উচিত ছিল গঙ্গা পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা নদী। সারাদিনে কটা মৃতদেহ বহে যায়? কতগুলি আধ পোড়া মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়? হিন্দুরা এই নদীকে বলে পবিত্র। ঘটনা হচ্ছে ভারতের সবকটা নদীই নোংরা এবং দূষিত। হিন্দুত্ববাদীরাই নদীগুলিকে দূষিত করে। তারপর নদীগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য মিথ্যা দেবতার উপরেই নির্ভর করে।" (পাতা-১২২-১২৩)

"(হিন্দুদের কাছে)মানুষ দেবতা হতে পারে, নারীরা দেবী হতে পারে।.... জন্তুরাও দেবতা, সাপও দেবতা ...তারা (হিন্দু দেবতারা) নিজেদের মধ্যে লড়াই করে,নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে, নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায়, তারা চুরি করে, মাতাল হয়, রক্ত পান করে, পুনর্জন্ম লাভ করে জন্তু, মাছ বা কচ্ছপ হয়ে, তাদের কেউ কেউ পর্বত তুলে ধরতে পারে। কিছু দেবতা পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে, এতৎসত্ত্বেও সন্তান উৎপাদন করতে পারে। এইসব দেবদেবীরা সব সময়েই সশস্ত্র, কারণ, তারা হত্যা আর লুটপাটে বিশ্বাসী। কিছু দেবতা বিশ্বাস করে তাদের লিঙ্গ পরমাণু বোমার চেয়েও শক্তিশালী। অন্যেরা জন্তুর মতো নগ্ন হয়ে থাকে তার অনুসারীদের সঙ্গে। কেউ কেউ সময় কাটায় যোগ করে। অন্যেরা থাকে সমাধিতে, তারা সুখী হয় তাদের অন্ধ অনুগামীদের দেখে। ....তুমি তোমার পাপ ধুয়ে ফেলতে পারো দেবতাদের লিঙ্গ পূজা করে।(পাতা-১৪৬)

"আর্য হিন্দুরা কী করে পৃথিবীতে আর্যায়ণ করবে? আর্য হতে গেলে আর্য্য মহিলার গর্ভে জন্মলাভ করতে হয়। যদি আর্য হিন্দুরা আর্যায়ণ করতে চায় তাহলে তাদের মহিলাদের গর্ভ ধার দিতে বা ভাড়া দিতে হবে অনার্যদের। অনার্যদের ব্রাহ্মণ নারী দিতে হবে যাতে তাদের সন্তানরা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মায়।" (পাতা-১৮২-১৮৩)

"আধুনিক ভারতে বহু রাম নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে। তারা বহুবার বিয়ে করে, তাদের স্ত্রীকে বিতাড়ন করে, আবার বিয়ে করে, স্ত্রীকে বিতাড়ন করে। বহু রাম স্ত্রীকে হত্যা করে। তারা তাদের দেবতা রামের অনুসারী।" (পাতা-২৬৯)

"(শ্রী) কৃষ্ণের যৌন জীবন কলঙ্কময়। ....শ্রীকৃষ্ণ বিখ্যাত তাঁর প্রেম জীবনের জন্য। তাঁর ১৬০০৮ টি স্ত্রী ছিল। প্রতিটি যাদব নারী ছিল তাঁর অবৈধ প্রেমিকা। তাঁর নোংরা যৌন জীবনের গল্পের জন্য নারীরা তাঁর দিকে ধাবিত হয়।" (পাতা-৩৯১)

এই বই হিন্দুদের কাছে ঈশ্বর নিন্দার সমান। ভারতের দণ্ডবিধিতে ঈশ্বর নিন্দার জন্য আইন আছে। এই বইয়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ হলে রাজস্থান সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। আর্চবিশপ ও তাঁর গুণধর পুত্র রেভারেন্ড টমাসের বিরুদ্ধে রাজস্থান সরকার মামলা রুজু করে।

শেষ

পরিশিষ্ট

১১ই ফেব্রুয়ারীর দৈনিক স্টেটসম্যানে প্রকাশিত চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠির অংশ বিশেষ:

"ভারতের অনেক জেলায় রবিবার দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখা যায় নানা দিক থেকে গরিব আদিবাসী, বনবাসী ভাইবোনেরা পরিষ্কার কাপড় পড়ে সেজেগুজে গীর্জায় চলেছেন দলবেঁধে। মুর্শিদাবাদে তো ধর্মান্তরকরণের মোচ্ছব চলছে। কমিশনে কাজ করে বহু যুবকযুবতী প্রচুর রোজগার করেন। আমাদের এলাকায় (সাগরদিঘি) এজেন্টের কাজ হল একটি অখ্রিষ্টান পরিবারের মাথা ধোলাই করে মণিগ্রাম গীর্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া। তারপর দিনক্ষণ দেখে তাকে ধর্মান্তরিত করা, তার আগে কাগজপত্র আইনত ঠিক করে নেওয়া। এজেন্টরা ভালো কাজ করলে তাদের নিয়ে বছরে ৩-৪ বার কৃষ্ণনগরে বিরাট সম্মেলন হয়, খানা-পিনা হয়। এরাও প্রচুর জমি জিরেত কিনতে লেগেছে। বছর অন্তর কলকাতা এয়ার পোর্ট থেকে রিজার্ভ করা চোখ ধাঁধানো ভলভো বাসে আসেন বিদেশী সাহেবরা। তাঁরা বার্ষিক সম্মেলনে ঢুলন্ত চুলুপায়ী সরল আদিবাসীদের সামনে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন, পরিসংখ্যান দেন। এখন যে কেউ এলেই দেখতে পাবেন ঐসব জাত মেরে দেওয়া আদিবাসীদের যৌবনবতী মেয়েরা কীভাবে প্রায় ক্ষেত্রে লুঠ হয় কিছু লোকের লালসার কাছে। ওইসব পরিবার যাতে অন্য স্কুলে সন্তানদের না পড়ায় তার জন্য পার্থেনিয়াম গাছের মতো গ্রামে আছে ডন বসকো, ফাদার জোসেফের স্কুল। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের মাটি ব্যবহার করে বন্ধ ঘরে হাঁটু গেড়ে ছোট বাচ্চাদের প্রার্থনা করানো হয় প্রভু যিশুর সামনে। সমস্ত সরকারী স্কুলের পরিসংখ্যান নিলে বোঝা যাবে অপদার্থ বেতনভোগী সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলির ডি আই, এস আই রা সুদৃশ্য ডায়েরী আর খ্রিসমাসের কেকের লোভে এসব দেখেও না দেখার ভাণ করে। তবে তারা বলবে এ ধনুক আমি ভাঙিনি। শিক্ষামন্ত্রীও বলবেন আমি ভাঙ্গিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, যেই ভাঙুক 'কনটিজেন্সী' ফান্ড থেকে আবার কিনে নাও। হরধনু কে ভেঙেছে? এ প্রশ্ন তাই না করাই ভাল। এরা বুদ্ধি করে শিক্ষা আর স্বাস্থ্যজগত দখল করে সেবার আড়ালে প্রতি বছর হিন্দুদের সংখ্যা কমিয়ে খ্রিষ্টান করে চলেছে সরকারী মদতেই। তার বিনিময়ে এককালের শীতল মুর্মু, মদন টুডু, বরকা হাঁসদারা এখন গ্যাব্রিয়েল, টমাস ইত্যাদি নাম পাল্টে প্রচুর সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া সীমান্ত জেলাগুলিতে প্রতি বছর কম করে কয়েক শো হিন্দু যুবতী 'লাভ জেহাদের' মাধ্যমে প্রেম করার কৌশল না বুঝে ফাঁদে পা দিয়ে কোথাওবা জোর জবরদস্তি, কোথাও বা পুলিশের ও নেতাদের মদতে অসহায় বাপ-মায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে হচ্ছে। প্রতি থানায় এর বহু প্রমাণ আছে। স্কুল, রাস্তায়, অফিসে কোথাও আর হিন্দু মেয়েরা নিরাপদ নয়। প্রাইভেট পড়তে গেলে সেখানেও ধরছে। যে বেহায়ার মতো ডাকলেই আসে না, তার পাড়ায় মোটর বাইক নিয়ে সকালে বিকালে হামলে পড়ছে। সেই পাড়ার হিন্দু ক্লাবকে প্রচুর খরচ করে হাতে রাখছে। এ ভাবেই প্রচুর ধর্মান্তরিত হচ্ছে।"

সাবধান!

ভেরিয়েন এলুইন ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে উপজাতিদের খ্রিষ্টায়িতকরণ সম্পর্কে সতর্কীকরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এখন যে গতিতে খ্রিষ্টায়িতকরণ চলছে তাতে অচিরেই সমস্ত আদিবাসীরা ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে। এর ফলে এরা পরিবর্তিত হবে একটি বিবদমান, জাতীয়তাবিরোধী, আক্রমণশীল সংখ্যালঘুতে। যাদের মধ্যে আদিবাসীদের সুসংস্কার কিছু থাকবে না, কিন্তু থাকবে কিছু নতুন সংস্কার, যা ভবিষ্যতের ভারত সরকারের পক্ষে কাঁটা হয়ে উঠবে।

লেখকের অন্যান্য বই

১। রবীন্দ্রচেতনায় হিন্দু মুসলমান
২। নবরূপে ডিরোজিও
৩। কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ
৪। বাঙলার মাটিতে ইসলামের উদয় ও বিকাশ
৫। বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ইসলাম
৬। সরওয়ারের তলোয়ার
৭। অপলাপবাদ ও ভারত ইতিহাস-কোনরাড এলস্ট
৮। যত মত তত পথ ও দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসাধক
৯। **The Quran for the Stupid Indians**
১০। রাম জন্মভূমি-বাবরী মসজিদ মামলা বাম শঠতার বৃত্তান্ত
১১। মাদার টেরেজা
১২। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ
১৩। গোধরা, গুজরাট ও আমাদের বুদ্ধিজীবিরা
১৪। জ্যোতির্ময় রবি ও একখণ্ড কালো মেঘ
১৫। প্রাচ্যের কবি ইকবাল
১৬। নবরূপে তিতুমীর
১৭। মহর্ষি হরিনাথ মজুমদার ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ
১৮। উনিশ শতকের ধর্ম দূষণ -
রামমোহন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ
(স্বামী বিবেকানন্দের গুপ্ত রচনা সমেত)
১৯। মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী-একটি অকপট জীবনী
২০। সাভারকার, তাঁর মুচলেকা ও 'হিন্দুত্ব' এবং নুরাণী মোল্লা